বাতায়ন

এসো আলো

এসো আলো, এসো আয়ু

সম্পাদিকা
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

Volume 23 | January, 2021

Batayan

A literary magazine with an International reach

বাতায়ন

Issue Number 23 : January, 2021

Editor
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Sub Editor (Volunteer)
Sugandha Pramanik
Melbourne, Australia

Design & Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support
Susanta Nandi, India

Chief Editor & CEO
Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Tapas K Roy — **Front Cover**
Painting Theme : Eso Aalo

Tapas K Ray is a researcher of Economics by profession. He lives in the US. Predominantly he is an artist and a painter. Because of this he has a unique way to look into things. Tapas is also a poet. His artwork and poems have been published in magazines in the US and India.

Saumen Chattopadhyay — **Front Inside Cover**
IL, USA

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

Tirthankar Banerjee — **Back Inside Cover**
Perth, Western Australia — King's Park, Western Australia

His interest in photography started in student days. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

Back Cover

Subramaniam Bhatt
Perth, Western Australia
Banksia (Grevillea) – Native Bush Plant of Western Australia

Subramaniam Bhatt is a professional Hindu priest and enthusiastic photographer, Western Australia, Perth.

Supriya Ghosh — Page No 25
Perth, Western Australia — Black Swan on Canning River

Supriya Ghosh has a PhD in English and has been teaching Academic and General English, Writing and Editing, to international students for several years. A keen observer of Natural beauty in its myriad forms, she holds an almost pantheistic awe of Nature. Lives in Perth, Australia.

(শ্রীজাতর ছবি বাতায়নের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে)

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

এসো আলো, এসো আয়ু

"If winter comes can spring be far behind ?"

Ode To West Wind / P. B Shelley

এ ভারী সহজ আর চেনা কথা। এক সরল সত্যি। প্রতিশ্রুতিও বটে। শীত এলে আসতে হবে বসন্তকেও। প্রকৃতির ছন্দের এদিক ওদিক হওয়ার যোটি নেই। না – অতিমারীর সময়েও অটুট এই বছরইয়ারী খেলা। যা শুরু হয়েছে তা শেষও হবে একদিন। সেরে যাবে পৃথিবীর অসুখ। সংক্রমণের কবল থেকে আরোগ্য লাভ করবে মানুষ। নতুন বছর। নতুন আশায় বুক বেঁধে উঠে দাঁড়ানোর সময়। মাটি পেলে প্রতিমা বানানোর সময়। স্বাগত ২০২১।

২০২০ র বিদায় মুহূর্তে স্মৃতিমেদুরতা কিছু কম ছিল। ছিল প্রহর গোণা। আলোর স্পর্শে দুঃস্বপ্নের কাল কেটে যাওয়ার প্রতীক্ষা। পাওয়া হারানোর হিসেব মেলানোর মতো মানসিকতাও হয়তো ছিল না। কিসের পাওয়া ? জমার ঘরে বিশবিশ (২০২০) সালে শুধুই বিষ। তাই বিদায়বেলায় ছিল অস্থিরতা। ধরে রাখার চেষ্টা তো নয়ই বরং আরো দ্রুত যাতে এ বিভিষীকাময় বছর শেষ হয়ে যায় তার আকুতি।

কিন্তু ইতিহাস নিস্পৃহ। সাধারণ মানুষের আবেগ অনুভূতিতে সে বিচলিত নয়। তার কাছে এ অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতার বছর। অতিমারী খুব সহজ সময় তো নয়! বিগত বছরে বহু মানুষকে হারিয়েছি আমরা। কেউ চলে গেছেন মরণ ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে না পেরে। কেউবা জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ মেনে। এঁদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ ছিল না। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্বের আলো ঘিরে ছিল আমাদের। বছরের শুরুতে চলে গেলেন সাহিত্যিক দেবেশ রায়, আনিসুজ্জামান। চলে গেলেন বাঙালীর প্রিয় ফুটবলার চূণী গোস্বামী, হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতের নক্ষত্র পণ্ডিত যশরাজ। হারালাম সঙ্গীত জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এস.পি বালাসুব্রাহ্মণ্যমকে। চলে গেলেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আবুল হাসনাত, সুধীর চক্রবর্তী। আর বছরের শেষে আপামর বাঙালীর বুক খালি করে চলে গেলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলার বাইরেও আছেন প্রিয় ব্যক্তিত্ব যাঁরা চলে গেলেন ২০২০তে। চলে গেলেন ফুটবল মাঠের মহারাজ মারাদোনা, কোরিয়ান চলচ্চিত্র দুনিয়ায় নবজাগরণের প্রধান হোতা কিম-কি-দুক।

তাহলে ২০২০ কি শুধুই হারানোর বছর ? ভেবে দেখতে গেলে পাওয়া আর হারান একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ২০২০তে কি পেয়েছি আমরা ? ব্যক্তিগত জীবনে আর বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে ? ফিরে দেখলে মনে হয় ২০২০ মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের সাক্ষ্য। মাটির গভীরে শিকড় চালিয়ে প্রাণরস আহরণ করে বেঁচে থাকে যে গাছ তার কাছে মাথা নিচু করে শিখেছি আমরা এক অন্য অভিযোজন। অতিমারীর চ্যালেঞ্জের কাছে আত্মসমর্পণ না করে বাঁচার পথ খুঁজে চলেছি নিয়মিত।

"Go to the limits of your longing .... Let everything happen to you : beauty and terror"— Rilke এই ভাবনায় জীবনকে আবিষ্কার করে চলেছি নতুন নতুন রূপে। গান, গল্প, কবিতা, উপন্যাস লিখেছি।

অতিমারীর সঙ্কটকালে হাল ছাড়ে নি বাতায়ন। কিছু দেরী, কিছু অপেক্ষা হয়তো। তবে সবসময়ই সে অপেক্ষা সার্থক হয়েছে পাঠকদের। তাঁরাও পাশে থেকেছেন। উদ্বেগ ও আশঙ্কা সত্ত্বেও বন্ধুরা সরে যান নি দূরে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি আমাদের বন্ধুদের সৃজনশীলতার অনুপ্রেরণা হতে। অন্ধকার দিনেও সৃষ্টির উৎসবের আলো জ্বালাতে। ২০২১ এর প্রথম বাতায়ন বৈদ্যুতিন সংখ্যা প্রকাশিত হল। আপনাদের জন্য আমাদের ভালবাসার উপহার শ্রীজাতর কবিতা। এ সংখ্যায় সেই বিশেষ আকর্ষণ তো রইলই, – এছাড়াও আছে দুটি বড় গল্প, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও আবুল হাসনাতের স্মরণে প্রবন্ধ, বেশ কিছু ছোট গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী আর নাটক।

আগামী বছর অন্ধকার থেকে আলোর জগতে উত্তোরণ হোক মানুষের। সকলের জন্য শুভ হোক ২০২১। বাতায়ন পত্রিকার পক্ষ থেকে সকলের আগামী দিনের অনেক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা রইলো। আপনাদের জীবন সুস্থ ও সুন্দর হোক। খোলা থাক বাতায়ন। আসুক আলো, আসুক আয়ু।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, বাতায়ন পত্রিকা গোষ্ঠী
২৬ শে জানুয়ারী, ২০২১

কবিতা

শ্রীজাত 7
শিকার

বিদিতা ভট্টাচার্য চক্রবর্ত্তী 9
মোহ

সুনন্দা বোস 10
বিষজল পান করি

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় 11
একলা চেয়ার

সৈমন্তী বিশ্বাস সান্যাল 12
পালক

তৃষ্ণা বসাক 13
যদি

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় 14
বৈষম্য –

তপনজ্যোতি মিত্র 15
পুনর্জন্ম

সঞ্জয় চক্রবর্তী 16
শেষ না হওয়া গল্প

মানস ঘোষ 17
করোনার পরে

উদ্দালক ভরদ্বাজ 18
নীরা, ঋণ, রিনি

জিষ্ণু সেন 19
অবচেতন

সুপ্রতীক মুখার্জী 20
একুশে গাইন

জয়িতা সেন 21
হাওয়া বিলাস

সুদিত শেখর মুখোপাধ্যায় 22
রবীন বাবুর ব্যামো

ইন্দিরা চন্দ 23
অমোঘ

তাপস রায় 24

অন্ধ শাড়ি বিক্রেতা

পৌরাণিক গল্প

জয়তী রায় 26

অহল্যা

দেবশ্রী মিত্র 33

সিদ্ধার্থ মায়াদেবীপুত্র

গল্প

সুজয় দত্ত 36

সার্ভিস

শাশ্বতী গুহঠাকুরতা 41

বয়ে চলা সময়ের গল্প

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য 47

খেলা যখন

কৌশিক মজুমদার 50

পোস্টকার্ড

সোমা ঘোষ (চক্রবর্তী) 62

তারেই খুঁজে বেড়াই

অন্য স্বাদের লেখা

মহুয়া কাঞ্জিলাল 76

রুইসারা তাল ট্রেকের গল্প

স্মৃতি ভদ্র 85

রসুইঘরের রোয়াক

সাক্ষাৎকার

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় 95

"মানবী"র নেপথ্যে যে মানবী

প্রবন্ধ

পল্লববরন পাল 99

অলোকরঞ্জন – শব্দযন্ত্রী শব্দগ্রন্থী

আদনান সৈয়দ 103

ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায় এবং একজন আবুল হাসনাত

নাটক

সুদীপ্ত ভৌমিক 106

''সাদা কালো''

শ্রীজাত

শিকার

যে-ভাষা অনেক কষ্টে আয়ত্ত করেছি
আমি তার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখি ধনুক।
যদি বন-বনান্তরে সন্ধে নেমে যায়
সে আমার দু'হাত থেকে হরণ করুক শিকার।

কে কখন বৈরী হল স্বরজ পঞ্চম
বোনেদের অভিমানের সামনে যেমন ভাই
নামিয়ে শস্যের ভার শহর তুলে ধরে –
আমারও তেমনই দিন এসেছে শ্রান্ত।

আলেয়ার মন দেখে চোখ ঝলসে গেছে আমার।
এ যাবত কম হল না চাবুকে সম্মান
কাদের ওই দূরের বাড়ি, ভাত চেপেছে সবে ...
দেখি আজ পাতায়, শাখে নেমে আসছে পাখি

ক্ষেতে প্রাণ ফেরাতে একমাত্র পারে সেচই,
যাতে ফের অন্যের রোদ ধুইয়ে নেবে তনু –
আমার এই অব্দি ছিল আসার অভিপ্রায়,
শোকে তাই পাহাড় ভাঙা, খুশির মনোবিকার।

জ্বেলেছি ধারের আগুন, কুড়িয়ে পাওয়া মোম
কাজলের কিনার যেমন বিরহে রোশনাই –
এখানে সময় বেশি, সন্ধে নামার পরে
পুড়ে যে যেতেই হবে, শরীরও জানত।

অবসর আসছে। এবার নিভৃত এই খামার,
জ্বলে বন-বনান্তরে স্বয়ংপ্রভ গান
যে-ভাষায় আগামীদিন, সময় লেখা হবে –
আমি তার পায়ের কাছে তূণীর খুলে রাখি ...

আমি আর কয়েক প্রহর বাঁচব স্বপ্নে
খাতা এক প্রাচীন শহর, ভাঙা সেতুর মন
আবারও সেসব লেখা দেখে দেবেন জয়

বাতায়ন

সংকলন ২০২০

অতিথি সম্পাদক ঃ শ্রীজাত

সম্পাদিকা ঃ রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

Volume 5 | Issue Number 22 | July, 2020

Batayan

A literary magazine with an International reach

বিদিতা ভট্টাচার্য চক্রবর্ত্তী

মোহ

চুম্বন ফেরানো যায়
ছোঁয়াচ
এড়ানো যায়নি
মোহের ঘোরে

এড়িয়ে
পেরিয়ে পথ
ভালোবাসা বেঁচেছিল
গুটির ভিতর

দুচোখে অন্ধ বিস্তার
তবু অসংখ্য প্রবাল ছিল
ধমনীর কোণে
ছুটন্ত কণিকায়

বুড়ো পাইনের শিকড়
মাটি চুষে গভীর জলস্রোত
পৌঁছে দেয় আকাশের গায়ে
কথাহীন হাজার বছর

শুধু সাহসের ভরে
স্বপ্ন নয় সত্যিই সে
কাঁটাতারের সীমানা পেরোয়
ভালোবেসেছিল বলে

ইচ্ছে হয়নি তার
খেলার ছলে
দু-চারটে
পাপড়ি ছেঁড়ার।

সুনন্দা বোস

বিষজল পান করি

জল কোথা পাবে তুমি
সুপেয় দিঘির ?
এই নীল বিষজল শুধু
আকণ্ঠ পান করে যাওয়া
আমি ছাড়া আর কেবা নীলকণ্ঠ হবে ?

শুধু উড়ে যাওয়া
তুষার পেরিয়ে
নদী হয়ে বয়ে যাওয়া সাগর সন্ধানে
ঠিকানা কোথায় তুমি পাবে ?

বন্যপ্রাণ হাতছানি দেয় শুধু
অরণ্যের পানে
জনপদ এসেছি ছেড়ে বহুকাল আগে
যাযাবর ঘুরে মরি জলের সন্ধানে।

শুধু নীল বিষজল তুলে দাও হাতে
তাই শুধু আকণ্ঠ পান করে
আমি ছাড়া আর কেবা নীলকণ্ঠ হবে ?

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

একলা চেয়ার

চেয়ার একলা ছিল, কিছু দীর্ঘশ্বাস এসে বসেছিল
স্মৃতির পঙক্তিতে
এই পৃথিবীর যত অলেখা গল্পের সিঁড়ি ঠিক এইখানে
নেমে গেছে খনির গহ্বরে
না বলার কথার গুচ্ছ
অদেখা সুরের ছায়াছবি শূন্য চেয়ারের গায়ে লেগে আছে
অভিমানে, মায়ার বন্ধনে।

অমোঘ ইশারা নিয়ে কেউ কি খুঁজছে তাকে
অনুদিত রিক্ততার পাশে ?

হাঁ করে তাকিয়ে আছে নির্লিপ্ত আকাশ
তেমন তীব্রতা নেই চারপাশে

কেউ যেন চলে যাচ্ছে মহাপৃথিবীর দিকে
একলা চেয়ার ঐ জানালার পাশে
ভারি করে দিচ্ছে চোখে বৃষ্টিমগ্ন মেঘ।

সৈমন্তী বিশ্বাস সান্যাল

পালক

কানহা কোথায় পালাল ?
তার ময়ুর পালক প'ড়ে আছে উঠোনে
তাকেই জিজ্ঞেস করি, 'কোথায় গেল রে ?'
বলে 'কী জানি .....'
জ্বালাতন ! আমি তো দেবকী আমিই তো যশোদা
একবার প্রসব জ্বালা, একবার লীলা যন্ত্রণা
আমি প্রসবিনী হব ব'লে বরণ ক'রেছি
কারা
আমি মানুষ ক'রব ব'লে ঈশ্বরকে খুঁজে ফিরেছি
সারা পাড়া, গোকুল .....
কংসের হাসি আমি সহ্য ক'রতে পারিনি
পুৎনার চিৎকারেও আমার বুক কাঁপে
কানহা, কানহা ও কানহা .....
কানহা, তুমি যেখানেই থাকো অবিলম্বে এসে দেখা কর
তোমার একটিমাত্র ময়ুর পালক আমার কাছে
গচ্ছিত আছে, নিতে এসো;
যদি তুমি না আসো
জানবে, এই ময়ুর পালককে আমি ভেবে নেব
(আমার) কানহা .....
দুষ্ট মিষ্টি, অনর্থ করা, মাখন চুরির দায় এড়াতে লুকিয়ে
আড়াল থেকে মুখ বাড়ানো, বাঁশি হাত
আমায় বোকা বানিয়ে পালিয়ে যাওয়া,
সব সেইই,
সেইই জেনো তবে পাবে
আমার সব আলিঙ্গন,
আমার সব
অশ্রুধারা .....

তৃষ্ণা বসাক

যদি

যদি আমার বেড়ালের নাম মজন্তালি হয়,
কিংবা আমার কুকুর পুষতে ভালো লাগে,
অথবা ধরুন আমার কোন পোষ্যই নেই,
যদি আমার নাকটা ঠিক আপনার মতো না হয়,
যদি আমার স্তন থাকে কিংবা না থাকে আর আমি একজোড়া সুডৌল স্তন নির্মাণের স্বপ্ন দেখি,
যদি আমি এমন একটা ভাষায় কথা বলি যা আপনি জানেন না,
কিংবা আমার কোন ভাষাই না থাকে, ত।
যদি আমাদের পাড়ার সব বাড়ি রামধনু রঙের হয়,
যদি আমরা মাঝে মাঝে প্রথম পাতে তেতো না খেয়ে শেষ পাতে খাই,
যদি আমার বোন কাঁথা না বুনে দিনরাত আঁক কষে,
আর আমার মা ছাদে উঠে হঠাৎ হঠাৎ ঝুলঝাড়ু দিয়ে দু চারটে তারা পেড়ে আনে
আমরা খেলব বলে,
যদি আমার কোন বাপ মা নাই থাকে,
ল্যাবপ্রসূত আমাকে যদি একটা সঙ্কেত দেওয়া হয়
আর যদি সেই নম্বরটা আপনার মামাশ্বশুরের পছন্দ না হয়,
যদি
যদি
যদি
যদি
যদি . . .

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

বৈষম্য –

হয়ত বৈষম্য ছিল
তবুও জন্মান্ধ
ব্রেলের অক্ষরে লিখেছে
বীজমন্ত্র
নিস্পলক কাটিয়েছে
কুয়াশাপ্রহর
লক্ষ্যহীন যে নতজানু বোধ
তার পাপ পুণ্যের কলসে
কতটা ভস্ম জমলো
হিসেব রাখেনি,
মন্ত্রমুগ্ধ মন
প্রতিটি শুক্তি ছেনে
নিশ্চুপ তুলেছে
অলোকসামান্য সেইসব
মুহূর্তের মুক্তোদানা,
দূরের দীর্ঘতর গাছের মাথায়
ধীর লয়ে সন্ধে নেমে এলে
সে এক তমসাঘন শূন্যতাকেই
আপন নামে ডাকে
যে একদিন ছুঁয়েছিল
তার মেলে রাখা অক্ষরের প্রার্থনা,
সেই দিগ্‌ভ্রান্তমায়াতর্জনির
স্পর্শের স্মৃতি আজো লিখে রাখে
তার যাবতীয় বিষণ্ন গ্রন্থনা

তপনজ্যোতি মিত্র

পুনর্জন্ম

যে নদী শুকিয়ে গিয়েছিল, লুকিয়ে গিয়েছিল
সে কখন ফিরে আসে যৌবনে
সে যদি পড়েছিল শুধু তার বালি নিয়ে, পলি নিয়ে
সে আবার কখন জাগর মৌ বনে

যে ভালোবাসা রুদ্ধ হয়েছিল, স্তব্ধ হয়েছিল
মলিন জ্যোৎস্নার হাহাকারে,
সে আবার কখন দৃষ্টি পেয়েছিল, বৃষ্টি পেয়েছিল
আকাশ দিগন্তের চরাচরে

যে কবিতা হেরে গিয়েছিল, মরে গিয়েছিল
মরুভূমির উষ্ণ বালু ঝড়ে
সে আবার কখন জন্ম পেয়েছিল, মর্ম পেয়েছিল
অলীক শব্দমালার সমাহারে

সঞ্জয় চক্রবর্তী

শেষ না হওয়া গল্প

হাওয়ায় কোথাও আলতো পালক ওড়ে,
ঘুমের ভিতর আবছা কিছু আসে,
তিরতিরিয়ে অল্প ছায়া নড়ে
জলের বুকে অবাধ্য বাতাসে।

মেঘের বুকে নরম আলো পড়ে,
সাঁত্রে যেন বসলো ব্যুভোর পাশে,
নীল কাপোলায় তুলিতে টান মারে
রুবেন যেমন প্রথম রেনেসাঁসে।

তোমার কথা তারাই বলে যেন
ফিরছে তারা তোমারই পথ চিনে
ফিরতি মেঘে বৃষ্টি এলে জেনো
ব্রেখট নামালো নাটক বার্লিনে।

এক অভিমান সন্ধ্যা এসে নামে,
শেষের গল্প অল্প অন্তরালে,
ফিরলে দেখো চিলির কোনো গ্রামে
গল্প জোড়ে নেরুদা মিস্ত্রালে।

মানস ঘোষ

করোনার পরে

এবারে আমরা প্রবেশ করতে চলেছি
করোনাশূন্য নব পরিসরে,
নিজের নিজের সিটবেল্ট বেঁধে নিন,
বায়ুচাপ অর্ধেক হবে, অভিকর্ষ দ্বিগুণ।
অন্ত-হার্দ্যিক আকর্ষণবলের ধ্রুবক স্থাণুবৎ।

এ উড়ান কেবল মাত্র শক্তিশালী নীরোগ প্রজন্মের জন্য,
পিছুটান এবং হৃদয়দৌর্বল্যরহিত।
বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ এবং বিগত করোনাকালে
নির্জনবাস যাঁদের সহজলভ্য ছিল,
শুধুমাত্র তাঁরাই পৌঁছে যাবেন রোগমুক্ত
হাইপোক্লোরোবিভেদ রঞ্জিত সেই বিষণ্ন পৃথিবীতে।

বিগত মহামারীতে আপনারা যে গল্প উপন্যাস রম্যরচনা লিখেছেন তার আর কোনো মূল্য থাকবেনা
করোনা উত্তর সময়ে,
সমস্ত জীবনমুখী গান বয়ে চলেছে বিপরীত অভিমুখে,
স্বেচ্ছায়, বাস্তবতা মেনে...
কণ্ঠনালী থেকে ফুসফুসের দিকে !

তবু কয়েক মাইক্রনের মাপে শব্দের অন্তর্ঘাত,
বর্ণমালার নিষিদ্ধ অনুপ্রবেশের কথা যদি কানে আসে...
নিশ্চিত জেনো, -
জন্ম নেবে ভস্মথিত ফিনিক্সের মত নতুন আখ্যান,
ধ্বংসের শীতল ছায়ায় শুরু হবে প্রাগৈতিহাস,
শুধু পাথুরে আগুন জ্বালাবার জন্য থাকবে
কিছু চকমকি মানুষ, এছাড়া নোয়ার শেষ ফেরীতে
জায়গা পাওয়া কিছু অমর কবিতা..
প্রত্যাশারহিত আনন্দবার্তার মত অকপট ও ঋজু !

উদ্দালক ভরদ্বাজ

নীরা, ঋণ, রিনি

নীরা নাম্নী মেয়েটির কাছে সুনীল
নামের যুবক কবির ছিল অনেকটা ঋণ;
সারাজীবন কবিতা লিখেও শুধতে পারেন নি।

তুমি নীরা নও, তোমার সঙ্গে আমার
বলতে গেলে পরিচয়ই নেই।
তবু তোমার কথা ভাবতে গেলেই আমার
বুকে জমা হয় এক রাশ শ্রাবণের মেঘ;
দুলে ওঠে সসাগরা পৃথ্বী, হারানো যৌবন
উঁকি দেয়, সহসা রোমাঞ্চিত দেহকুলে।
এবং কোন ঋণ ছাড়াই তোমাকে নিয়ে
লিখে ফেলেছি আমি প্রায় একশো আটটি কবিতা।

তবু আমাদের কোন কিশোরগঞ্জের স্মৃতি নেই
নেই কোন বালকবেলার লেবুতলার খেলাঘরও।
তুমি এক আশ্চর্য প্রদীপ, ম্যাজিকের মত
এসেছ আমার কূলে। ভোরের সৈকতে-
কুড়িয়ে পাওয়া কাঁচের কৌটো তুমি,
তোমার মধ্যে জমা আছে আমার হাজার
জীবনের দীর্ঘশ্বাস, আমার সমস্ত অতীত,
আমার সকল ভবিষ্যৎ

তোমার কাছে এক সমুদ্র ভালবাসা, ধার চাইছি রিনি;
তোমায় চিনব বলে...
তোমার ঋণে ডুবে থাকব বলে...
তোমায় নিয়ে আরও এক অক্ষৌহিণী
কবিতা লিখব বলে...
দেবে?

জিষ্ণু সেন

অবচেতন

বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যা নামল,
বন্ধুর ডাকে দিবানিদ্রা টা গেল

এদিকে চলে আয় নির্ভয়ে,
খেলব মনের সুখে, যতক্ষণ ইচ্ছে

নেই কোন হোমওয়ারকের চাপ,
বা মা এর পড়তে বসার হাঁক

গোধূলির ক্যানভাসে তখন বান্ধবীদের সিঁথি
পাশে ঘুমন্ত বউ, দূরে ছেলের হাসি

জানি সচ্ছলতা, কীর্তি বা ঠোঁটের উষ্ণতা
চেলা কাঠের আগুনে পাবে না পূর্ণতা

রক্তের এক বিপুল বিপন্নতা গভীর নির্জনে,
আজও দেয় হাতছানি মনের গহনে

ঘুমন্ত বউ আমার দিকে পাশ ফিরে শুল ।

সুপ্রতীক মুখার্জী

একুশে গাইন

অলস বেলায় পাখীর গানে
ভাব্‌না মেলে ডানা,
হিসাব থাক
তর্ক থাক
অলস মনে আকাশপানে
তুলির নানা রঙের টানা ...
নেই যে কোনো মানা।
বিপাক! ...
রঙ গুলো সব জড়িয়ে যায়
কেউ তাজা, কেউ ভগ্ন প্রায়,
কেউ গড়িয়ে স্বপ্নপুর
কেউ হারিয়ে নিঝুমপুর
রঙগুলো সব থাক! ...
রঙের চমক যাক! ...
পারবে কি মন পেরিয়ে যেতে
আন্‌মনেতে সেই দেশেতে?
ভালোবাসায় যে'খানেতে
রঙ ছাড়া মন মিশে যেতে,
ভালোবাসার সন্ধানেতে
রঙ ছাড়া মন মেললো ডানা
নেই বাধা, নেই মানা।
...
পাখীর গানে ভোর হয়ে যাক,
তর্ক হিসাব থাক!
রঙহারা মন রঙীন আভায় মেললো ডানা ...
আকাশ রাঙা।।

জয়িতা সেন

হাওয়া বিলাস

এক একটা হাওয়া এক একরকম
গন্ধ নিয়ে আসে
এক একটা হাওয়া
রোদের সবুজ আদর মেখে থাকে
এক একটা হাওয়ায় মাঠের শেষে
দুই নারকেল গাছের দোলা
পূর্ণিমার চাঁদ কপালে
কিশোরী সাঁঝবেলা
কোনো কোনো হাওয়া ছুঁয়ে যায়
মনকেমনের কানের লতি
অবুঝ হাওয়ায় অবুঝ মেয়ে
হাত পায়ে যে দড়ি
এক একটা হাওয়ায় মধ্যরাতের
পালকগন্ধী পরশ
দমকা হাওয়ায় খাদ কিনারা
রক্তে সোমরস
হাওয়ার মধ্যে হঠাৎ একটা
অন্য হাওয়ার আয়না
হাওয়া যেখানে থমকে দাঁড়ায়
আর তো ফেরা যায় না

সুদিত শেখর মুখোপাধ্যায়

রবীন বাবুর ব্যামো

রিটায়ারমেন্টের পরের দিন থেকেই
রবীনবাবুর একটা ব্যামো শুরু হয়েছে,
সকালটাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

ভোরের সূর্যটাকে মনে হচ্ছে
বিকালের অস্ত-যাওয়া সূর্য।
সাড়ে সাতটার কারখানার সাইরেনের
আওয়াজটাকে মনে হচ্ছে
বিকালের ছুটি হওয়ার সাইরেন।
সাতসকালে কা কা করে
সারাটা পাড়া মাতিয়ে রাখতো যে কাকগুলো –
মনে হচ্ছে,
সকালের সেই কা কা আওয়াজটা নেই।
সারাদিনের পরে বাসায় ফেরার
যে কা কা আওয়াজ –
ঠিক সে রকমই।

সেই যানবাহনের আওয়াজ
মানুষের ব্যস্ততা –
সবাই দৌড়চ্ছে,
সময়ের মধ্যেই পৌঁছতে হবে,
সেরকমটা আর নেই।
গাড়ী, ঘোড়া, মানুষজন সবাইকেই মনে হচ্ছে –
দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে যেমন বাড়ি ফেরে
ঠিক সেইরকম।
তাহলে কি সকাল বেলাটা হারিয়ে গেলো ?

নিজের মনেই মুচকি হাসেন।
তা কখনো কি হয়?
একটা গোটা দিন থেকে
সকাল কি কখনও হারিয়ে যায় ?
রাস্তার ধারে বারান্দায় কাঠের চেয়ারে
সারাটা দিন মানুষটা বসে থাকেন।
আর মাঝে মাঝেই
পথ চলতি মানুষকে জিজ্ঞেস করেন –
হ্যাঁ গো সকালটাকে দেখতে পাচ্ছ ?
সকালটা কি হারিয়ে গেলো ?
বলতে পারো
আবার সকাল কবে আসবে ?

ইন্দিরা চন্দ

অমোঘ

ঐ সেতারের তান শুনতে পাচ্ছো ?
তার না বলা বাণীর ঝংকারে কি সমবেদনা বাজছে ?
কার জন্য বলতে পারো ?

কে সে যার করুন আর্তি চোখে জল আনে ?
সে কোন অজানা বাতাস যে নীলচে ঠোঁটে হাসি ফোটায় ?
জানো তোমরা কেউ ?

একটি ফুলের পাপড়ি দীঘিতে ঝরে পড়লে,
জলের বলিরেখা তরঙ্গায়িত হয়ে জানায়
স্থিতি আর প্রলয়ের মাঝে
আছে এ জীবন

চিরাচরিত জীবনযুদ্ধের অবসন্নতা কাটিয়ে ওঠার অদম্য নেশায় যে অজানা অনাগত আবছায়ার হাতছানি দেখা দেয়
তাকে দেখে ভয় হয়,
মাথার ওপর আকাশ
আর মাটি ওপর ঐ আকাশচুম্বি অট্টালিকার মাঝে
আমরা রোজ গড়ি তাসের ঘর
শুধুমাত্র ভেঙে চুরমার হবার জন্যই

এ দুনিয়া কি কেবলই দখলদারির ?
কেড়ে নেবার নির্লজ্জতায় মগ্ন ?

রূঢ় বাস্তবতার আলোয়
এ সত্য
স্বচ্ছ ও স্পষ্ট।

তাপস রায়

অন্ধ শাড়ি বিক্রেতা

যে সব নারীর কাছে একদিন
দুপুরের মৌরি গন্ধ রোদে
মন খারাপের শাড়ি মেলে ধরেছি
পুরনো বাটিক প্রিন্ট
গাছ, পাখি, মন যমুনা, রাধাকৃষ্ণ
অথবা কুহক ফেরিওয়ালা মিশরের
বাঁশি হাতে নীলনদ পার হয়ে যায়

সেসব নারীদের আমি ভুলে গেছি
অথবা পোরসেলিন পুতুলের মতো
সাজিয়েছি তাকভরে স্মৃতির গুহায়
সুগন্ধি আতর করে ঢেলেছি-মিশিয়েছি
মৃগনাভি, লোপ পায় হাওয়ায় হাওয়ায়

এখন
চাঁদ ওঠে তারাদের সমাবেশে
বেখাপ্পা পৃথিবী; ধুলো ক্লান্ত ফুসফুস
নারীরা ফিসফিস করে কথা বলে
কলঘরে জানালায় জ্যোৎস্না আঁকে
শাড়ির আঁচল ওড়ে রাতের আকাশে

আমি শুধু দেখিনা তাদের
কানে ভাসে বাগেশ্রী মিহিন বাতাসে

না-কেনা শাড়ির স্তুপ দেওয়ালের মতো
আমাকে ঘিরে রাখে, রেশমের গুটি যেন
ভাঁজে ভাঁজে ধুলো জমে, লালা গ্রন্থি অসার
ফুল পাখি বাঁশি
বিকেলের মলিন নদীরা ধুসর

যে সব শাড়ি না কেনা রয়ে যায়
তারা যায়না কোথাও, আপন থাকে
আর যেসব শাড়ি নারীরা কিনে নেয়
সেসব শাড়ি বিস্মরণে যায় ললিত মায়ায়

জয়তী রায়

অহল্যা

আজকাল বড় বিষণ্ন লাগে অহল্যার। কিন্তু কোনও কারণ খুঁজে পায় না। এ এক আশ্চর্য বিষণ্নতা ! এই যে এখন, কুটিরের বাতায়নের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সে, সকালের প্রকৃতি কত ভাবেই না সেজে উঠেছে ! নয়নসুখ হয় সবুজের সমারোহ দেখে। প্রজাপতির ওড়াউড়ি, শীতঋতুর প্রারম্ভে ঝরে পড়া পাতার দল ... আরো উদাস লাগে। মানুষ কখনও কখনও নিজের অন্তরের অলিগলিতে অনুসন্ধান করেও মনখারাপের কারণ খুঁজে পায় না। অথচ, মনখারাপটা সত্যি। ভীষণ সত্যি। অহল্যা হয়তো তেমন কোনও রহস্যময় বিষণ্নতায় বন্দী !

জীবনের কোথাও কোনও খুঁত নেই। আপাতঃ দৃষ্টির জীবনে ভিতরের ভাঙ্গন ধরা যায়না। নিবিড় অরণ্যের ভিতর মহর্ষি গৌতমের এই আশ্রম যেন সবুজ ঘাসের বুকে শিশিরবিন্দু। শান্ত, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র। এবং অহল্যা জানে আশ্রমে এই তিনের কোনও একটির অভাবে দেবভাব নষ্ট হয়। উদয়াস্ত এই শুদ্ধতা নিজের হাতে বজায় রাখে সে।

গৌতম ঋষি আশ্রমের অধিকর্তা। নিয়মের এতটুকু শৈথিল্য তিনি কখনও সহ্য করেন না। গম্ভীর স্বভাব, কঠোর মুখ, তপস্যায় শীর্ণ শরীর। আজকাল জটাজুট বৃদ্ধি করে চলেছেন নিয়ত। অহল্যার মনে হয়, একগুচ্ছ ঝোপের আড়ালে দুটি চোখ ভ্রুকুটি শাসনে নজর রাখছে তার উপর। স্বামীকে বড় ভয় করে তার। কিন্তু কেন! মাঝে মাঝে ভাবে স্বামী মানে তো আশ্রয়, অন্তরের বাসভূমি। অপরপক্ষে সেও আশ্রয় দিতে চায় নিজের পুরুষটিকে। কিন্তু এই সম্পর্কের ভিতর এত ভয় এসে জমা হয় কেন! নিজের কাছে হাজার জিজ্ঞাসার পরেও সদুত্তর মেলে না।

টিরটির শব্দ করে পাখি উড়ে যায়। যেন বিদ্রূপ করে ওঠে। বাতাসের হিল্লোল কুটিরের বাতায়নের সামনে এসে হেসে ওঠে। যেন বলতে চায়, "কারণ জানো না তুমি ? সত্যিই জানো না ? না কি জানতে চাও না ?"

অহল্যা রেগে ওঠে। এ কেমন অদ্ভুত কথা ! সে জানবে না ভিতরের মনোভূমিতে কেন জেগে উঠছে অন্ধকার ? ভিতরের মনোভূমি ! সেখানে সন্তর্পণে মাঝে মাঝে যায় বইকি। স্বপ্নের সোপান বেয়ে যায়। সে কক্ষে জ্বলছে এক ম্লান মাটির প্রদীপ। শূন্যতা। শুধু শূন্যতা। হা হা করছে শূন্যকক্ষ। শ্বাসবন্ধ হয়ে আসে।

কতদিন কেঁদে উঠেছে মাঝ ঘুমে। হাত বাড়িয়ে খুঁজেছে কাউকে। কেউ নেই। শূন্যশয্যা। পাথরের মত দাম্পত্য ভারি হয়ে চেপে বসে বুকের মাঝারে।

(দুই)

সে অপরূপ রূপসী। এমন কথা শুনে শুনে বড় হয়েছে। গোটা তিনভুবন জুড়ে তাঁর তুল্য রূপবতী না কি কেউ নেই ! মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রশ্ন করে পিতা ব্রহ্মাকে, "রূপবতী কন্যার জন্ম দিলে কেন পিতা ? আর দিলেই যদি তবে ওই বৃদ্ধ স্বামীর হাতে সম্প্রদান করলে কেন ? কেন ? কেন ?"

প্রশ্নগুলো আছড়ে পড়ে মাথা কুটতে থাকে তাঁর মনের প্রাচীরে। মুখে একটি শব্দ কোনোদিন উচ্চারিত করেনি পিতার বিরুদ্ধে। তিনি বিচক্ষণ মহান পুরুষ। সমগ্র দেবকুল মাথা নত করে তাঁর সামনে। তিনি কখনো ভুল করতে পারেন ? তিনি যদি ভেবে থাকেন এই প্রাচীন ঋষি তাঁর স্বামী হিসেবে উপযুক্ত, তবে তাই হবে সঠিক সিদ্ধান্ত ! তিনি অহল্যার পিতা হতে পারেন কিন্তু তার আগে তিনি একজন পুরুষ! নিজের ভাবনায় চমকে ওঠে অহল্যা। আবাল্য পালিত সংস্কার ধিক্কার দিতে থাকে। এমন ভাবনা কেন আসে ? ক্ষোভ হতাশার করাল স্রোত গ্রাস কেন করে তাঁকে ? স্বামী

সম্পর্কে এমন চিন্তা করা পাপ। যেমনই হোক স্বামী হলেন দেবতা। আর, আশ্রমে অবকাশ কোথায় ? এখন ভোরের আলো ফুটি ফুটি। আশ্রম বধূ সে। অনেক কাজ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। স্নান সেরে, সুকোমল বরতনু চন্দন চর্চিত করে। তখন একটু সময় বেশি লাগে তার। মেয়েলি মনটি সেজে উঠতে চায় রোজ নতুন করে। সে যখন সরোবরের জলে নিজের অপরূপ শরীরটিকে দেখে, তার আঠারো বছরের পেলব যৌবন দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায়। জল যেন নিজেই এগিয়ে এসে তাকে ছুঁতে চায়। তার উন্মুক্ত শরীরে ভোরের নীলচে আলো পড়ে উজ্জ্বল গোলাপি হয়ে ওঠে। আশ্রমের তরুলতাগুলি ঝুঁকে ঝুঁকে ছুঁতে চায় তার যৌবনের শুদ্ধতম আলো। এমন অপার্থিব সৌন্দর্যে চরাচর যেন মুগ্ধ, স্তব্ধ! সে ভাবে, আজ নিজেকে সাজিয়ে তুলবে অপরাজিতা মালায়। আজ স্বামীকে বিস্মিত করে দিয়ে কুটিরে এনে রাখবে বর্ষাস্নাত কদম ফুল। জল থইথই সরোবরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে সে। আজ সে অভিসারিকা। কি এক অজানা সুর গুণগুণ করে বুকের ভিতর। এখনো তাঁকে স্পর্শ করেন নি স্বামী। পিতা বলেছিলেন, "এমন সংযম ঋষির সম্পদ। তুমি ভাগ্যবতী অহল্যা। এমন সংযমী স্বামী পেলে!"

নাহ। ওমন ভাগ্যের প্রয়োজন নেই তাঁর। বরং, সে উথাল পাথাল নদী হয়ে ভাসিয়ে নেবে স্বামীর সংযম। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে নিজেকে শোনায় অহল্যা, "আমি অসংযমী পুরুষ চাই পিতা। আমার আবেগ ধারণ করবে এমন স্বামী চাই।"

(তিন)

আশ্রমের শেষ প্রান্তে আছে এক নির্জন বনস্থলী। স্থানটি দিনের বেলায়ও থাকে অন্ধকার। এখন যেহেতু বর্ষাকাল আর সেখানে আলোর প্রবেশ নিষেধ তাই মাটিভেজা। সেখানে একটি জীর্ণ কুটির আছে। সাধনার স্থান হিসেবে জায়গাটি সুপরিচিত। মহর্ষি গৌতমের আদেশে আজ দিন দুই হল, অহল্যা সেখানে থাকছে। দিনে একবার মাত্র আহার গ্রহণের অনুমতি পেয়েছে সে। একজন আশ্রম বালক পৌঁছে দেয় সামান্য কিছু ফল ও দুধ। ধ্যান করতে বলা হয়েছে তাঁকে। ধ্যান করলে সংযম বৃদ্ধি পাবে তাঁর। অল্প বয়সের অকারণ আবেগ থেকে মুক্তি না পেলে, সামনের জীবন নরকে পরিণত হবে!

নীল আকাশের মত সরল চক্ষুদুটি তুলে সে প্রশ্ন করেছিল, "কিন্তু আমার অপরাধ কোথায় ? ধ্যান তো ঘরে বসেও করতে পারি।"

"রূপবতী যুবতী তুমি। তার উপর এমন চঞ্চলমতি। তোমা হতে সর্বনাশ হতে পারে পুরুষকুলের।"

উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিল সে। ভয় কাটিয়ে আবার প্রশ্ন করে বসল, "রূপের জন্য আমি দায়ী নই। কিন্তু, প্রতিদিন আশ্রমের সমস্ত নিয়ম পালন করি। তবে ? চঞ্চলমতি কখন হলাম ?"

মহর্ষি জবাব দেন নি। গত কয়েক দিন অহল্যা অদ্ভুত আচরণ করেছে। যেগুলি সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে। একজন তপস্বী পুরুষের পত্নী হতে গেলে যে সমস্ত বোধ থাকা দরকার অহল্যা সে সম্পর্কে কিছুই জানে না। থাকুক কিছুদিন নির্জন সাধনায়। বৃদ্ধি পাবে মনের প্রসার। নিজের সঙ্গে মুখোমুখি বসে খুঁজে নিক জীবনের সার সত্য।

মহর্ষি আশীর্বাদের হাত রেখেছিলেন পত্নীর মাথায়। বুঝিয়েছিলেন সুন্দর করে। রিপুদমন করতে জানতে হবে। মানবজীবন রিপুর জালে বন্দী। ষড়রিপুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল হল কামরিপু। অহল্যার সর্ব প্রধান কাজ হল এই কামরিপু দমন করা। তবে, আর চিন্তার কিছু নেই !

"এ তো ভারি সহজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কামরিপু আমি দমন করে ফেলব। কিন্তু ..."

মহর্ষি শঙ্কিত। আবার কিসের কিন্তু ? সরল কণ্ঠে প্রশ্ন করে অহল্যা, "কামরিপু বলে কাকে ? সে সর্বনাশ করে কেন ?" কি করে? আমি তো কিছুই জানি না।

(চার)

গত দুইদিন বনস্থলীর নির্জন নীরবতায় বেশ কাটছিল অহল্যার। কেমন স্বাধীন। কেউ কোথাও নেই। কঠিন শৃঙ্খলা নেই। আশ্রমের বাতাবরণ কঠিন বইকি! সেখানে উচ্চঃস্বরে হাসি অপরাধ। সেখানে হরিণীর ছন্দে ছুটে যাওয়া নিষিদ্ধ। সেখানে নারী পুরুষের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। দুষ্টু হাসি হেসে ভাবল অহল্যা, যত বাঁধন তত ফাঁকি। আশ্রমের আবাসিক শিষ্যগণ, যাদের মধ্যে রাজা তথা বিভিন্ন ধনী গৃহের সন্তান বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসে, তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আড়চোখে সুন্দরী গুরু পত্নীদের দিকে তাকিয়ে থাকে। অহল্যা কে এক পলক দেখার জন্য কেউ কেউ ঘুরপথে বিলম্বে যায় পাঠকক্ষে ! তরুণী গুরুপত্নীদের আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, ঈশ্বর সাধনা ভিন্ন আর কোনো কাজে তাঁদের মন নেই। অথচ, হঠাৎ করেই খসে পড়ে কবরী বন্ধনের ফুলটি, জলপূর্ণ কলস চূর্ণ হয় ভূমিতে পড়ে ... ইতিউতি থেকে ছুটে আসে তরুণ শিষ্য। গুরু মায়ের রাঙা কোমল চরণের রূপের দিকে নতমুখে তাকিয়ে নীরব অর্ঘ্যর মত সম্প্রদান করে পুষ্প অথবা দ্রুত নিয়ে আসে নতুন কলস। এ যেন প্রকৃতির আরো এক খেলা। স্বাভাবিক ছন্দ। নর নারীর মন এই ছন্দে মেতে উঠবে এটাই স্বাভাবিক।

এত জ্ঞানী ঋষি মহাঋষিগণ এই সামান্য বস্তু অনুধাবন করতে পারে না ? জ্ঞান কেবল শুষ্ক হতে শেখায় ? প্রবৃত্তি দমন করো ... নতুবা সর্বনাশ। সমাজ যাবে রসাতলে ! হায় অবোধ জ্ঞান !

এইখানে অনেক ফুল ফুটেছে। বিচিত্র রঙ। কত বাহার। আহা! এখনো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে নি। ধ্যান না হয় আজ আর করবে না। আজ মনের আনন্দে নিজেকে সাজিয়ে তুলবে ফুলের গহনায়। কে দেখবে ? ইস। কে ই বা দেখবে ? শৃঙ্গারের প্রধান উদ্দেশ্য হল কেউ যেন দেখে। এখানে কেউ নেই যে ! পরক্ষণে মনে হল, কেউ নেই ? আজ পূর্ণিমা। একটু পরেই উদয় হবেন চন্দ্রমা। তিনি পুরুষ। তিনি দেখবেন অহল্যাকে। পুরুষ কেবল শুষ্ক কর্তব্যপরায়ণ ? সে কখনো সম্ভব ?

গুণগুণ সুর গাইতে গাইতে সাজতে বসল অহল্যা। মালা গাঁথা সম্পন্ন হয়নি তখনো, উৎকর্ণ হল কান। নারীর পৃথক ইন্দ্রিয় থাকে, সেই ইন্দ্রিয় তাকে সজাগ করে। কোনও গোপন অন্তরাল থেকে কেউ কি তাকে দেখছে! নাহলে কার তপ্তনিঃশ্বাস বাতাস বহন করে নিয়ে এল ফুলের সুগন্ধের সঙ্গে! অহল্যা সচকিত হয়ে ওঠে। কেউ তো আছে। সে কে ? যে হরিণশিশু গুলি তাঁকে ঘিরে ছিল, তারাও সচকিত হয়ে উপরপানে তাকাল। আকাশপথে আছে নাকি কেউ ?

(পাঁচ)

অহল্যার ভীরু দৃষ্টি এদিক ওদিক সন্ধান করেও এমন পরিবর্তনের প্রকৃত কোনও কারণ খুঁজে পেল না। অথচ কিছু একটা যে ঘটছে, তা তার নারীত্বের অদৃশ্য ইন্দ্রিয় দিয়ে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। আজ যদি কেউ আড়ালে থাকে, থাকুক। আজ যদি কেউ তাকে দ্যাখে ? দেখুক। কেউ চূর্ণ করবে সমাজ শৃঙ্খল ? করুক। নাহ। আর পারে না সে। মনের গভীরে শূণ্যঘরের হাহাকার গ্রাস করছে ক্রমশঃ। এই জীবন তাঁর নয়। এ মিথ্যা জীবন মেনে নিতে নিতে হলুদ ঘাস হয়ে যাবে একদিন ! এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা ফুলগুলি গুছিয়ে ফেলতে থাকে সে। সাজ রয়ে গেল অসম্পূর্ণ। থাক। বাতাসে ওড়ে খোলা চুল। উড়ুক। বসন শিথিল রইল। থাকুক। যে দেখছে, সে এভাবেই দেখুক। সে যেমনটি আছে তেমনটি দেখুক।

বাতাস যেন কানের কাছে বলে গেল, "তুমি অপরূপা।"

কে ? কে ? ওখানে কে ? হাতের অঞ্জলী থেকে ফুলগুলি ছড়িয়ে পড়ে গেল ভূমিতে। অহল্যা ফিরে তাকিয়ে দেখে এক দেবপুরুষ আর তাঁর দুটি মুগ্ধ চোখ।

হতচকিত অহল্যা শরীর ঢেকে নিতে চায়। অচেনা যুবাপুরুষ ! এখানে ! এই নির্জন কুটিরে ? সগর্জনে বাজ পড়ে । আচম্বিতে ভীত অহল্যা আশ্রয় নেয় দেবপুরুষের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে পুরুষ। ভয় নেই। ভয় নেই। আমি আছি তো।

অহল্যা সবলে সরিয়ে নিয়ে রুদ্ধ গলায় বলে ওঠে, "কে আপনি ? একজন পরস্ত্রীকে স্পর্শ করছেন ? এত স্পর্ধা ?

পুরুষ হেসে বলে, "স্পর্শ আমি করিনি। তুমি আশ্রয় নিলে। পুরুষের কর্তব্য নারীকে আশ্রয় দেওয়া। তিনি নিজের হন বা পরের।"

অহল্যার রাগ হয় ভীষণ। এই ব্যক্তি তাঁকে দেখে। রোজ দেখে। সে টের পায়। কেন দেখে ?

পুরুষ অবাক হয়ে বলে, "এ কি বলছ অহল্যা ? তোমার রূপ দেখবে না, এমন কেউ আছে না কি ? শুধু তোমাকে একবার দেখব বলে প্রতিদিন অমরাবতী হতে মর্ত্য ধামে আসি।

– আপনি ...

– আমি দেবরাজ ইন্দ্র।

– আমাকে দেখবেন ? শুধু এইটুকুর জন্য রোজ আসেন ?

– পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য ম্লান তোমার রূপের কাছে। আমি নিজেকে ধন্য অনুভব করি, তাই আসি।

– এসব কি বলছেন আপনি ! এ ঘোরতর পাপ। অন্যায় !

ইন্দ্র হাসে। রূপসী রমণী ঘিরে থাকে তাঁকে। তবু, কি এক প্রবল টান অনুভব করছেন আজ কিছুদিন হল। ঋষিপত্নী এই নারী। ঋষি ক্রোধে ধ্বংস হতে পারেন জেনেও ছুটে ছুটে আসেন। সাগরের মত নীল দুটি চোখ তাঁকে টানে। কষ্ট হয়। ভীষণ কষ্ট হয় একদিন না দেখলে মনে হয়, আজ বুঝি ভোর হল না! এই নারী তাঁর নয়। এ অন্য কারো। পরস্ত্রী। ভীষণ ক্ষমতাবান একজন ঋষির স্ত্রী। ওই নারীর চারিদিক ঘিরে আছে সামাজিক অনুশাসনের অগ্নিবলয়। সমস্ত জানেন তিনি। দেবরাজ কখনো নির্বোধ নন। তবু , দূরে থাকতে পারছেন না। এই দ্যাখো, বর্ষণক্ষান্ত মেঘ ছিঁড়ে এসে পড়েছে পূর্ণিমার চাঁদের আলো। কি অলৌকিক শোভা! ইন্দ্র মোহাবিষ্ট স্বরে বলে উঠল, "আমি তোমার পায়ের পাতায় একটি চুম্বন করব ? মাত্র একটি ?"

(ছয়)

ন্যায় অন্যায় বোধ যেমন থাকে তেমন থাকে প্রবল আবেগ। আবেগ ঈশ্বর সৃষ্ট। শাসন নিয়ম মনুষ্য সৃষ্ট। সমাজ শাসন মেনে চলা মানব জাতির কর্তব্য। এর বিরোধ হলে, সমুচিত দন্ড প্রদানের বিধান আছে সমাজে।

অথচ দেখো, এই অলৌকিক রাত, এই নিশীথ পুষ্পের তীব্র সুগন্ধ, এই আবছায়া আলো আঁধারি, চরাচর জুড়ে নীরব প্রহরার মাঝে কত সুখে মিলিত হয়েছে নারী পুরুষ। ইন্দ্র আর অহল্যা। নির্ভার মিলন। অহল্যার চম্পক বর্ণের অনাবৃত শরীরের শোভায় বিহ্বল ইন্দ্র।

আর অহল্যা? সে কোনওদিন জানতেই পারেনি এমন সুগন্ধী মাদকতা ছড়িয়ে থাকে পুরুষের ভিতর ! পুরুষের আপাত কঠিন দুই বাহুর ভিতরে থাকে মন-ভালো-করা তুমুল বৃষ্টির আয়োজন !

দেবতা হোক বা মানব, প্রেমের কাছে শর্তহীন সমর্পণ ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। প্রেমের তীব্রতার কাছে সব তুচ্ছ। প্রেম যদি মহাসমুদ্রের উত্তাল জলরাশি হয়, প্রেমিক বা প্রেমিকা সেখানে সামান্য কাঠেরডিঙি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের

কথা হল, কোনও কালে কোনও সমাজ প্রেমকে সহজভাবে স্বীকার করতে চায়নি! জীবনের এই শুদ্ধতম হৃদয়াবেগকে নৈতিক অধ:পতন এবং কলঙ্ক বলে চিহ্নিত করেছে।

দেবরাজ ইন্দ্র এ কথা জানে। জানে এই মহাকলঙ্ক শিরোভূষণ করলে ঋষিদের বিরাগভাজন হয়ে তার দেবরাজ-পদ অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে। সমস্ত সম্ভাবনার কথা জেনেও ইন্দ্র কেমন অসহায় বোধ করে! এই নারী তাকে এমন আকর্ষণ করছে কেন! নিজের কাছেই বিস্ময়বোধ করে ইন্দ্র। অপ্সরা থেকে দেবকন্যা – রূপসী কত ! তাহলে ! ইন্দ্র যেন উপলব্ধি করল, এ শুধু কাম অথবা শারীরিক কামনা নয়, এ এক অন্য আকর্ষণ। যে আকর্ষণ শরীর ছাড়িয়ে মনের আঙ্গিনায় মৃদঙ্গ বাজায়। এ কোনও সাধারণ নারী-সঙ্গ নয়। কারণ নারী সঙ্গে তিনি অভ্যস্ত। তাই নিছক নারী শরীরের জন্য এতসব ঘটনার কোনও প্রয়োজন ছিল না তার।

রোজ আকাশ পথে যেতে যেতে আশ্রমের মাঝে অহল্যাকে যখন দেখতে পেত, এক আশ্চর্য ভালো লাগায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠত। শুধু কী পরিপাটি রূপ ! নাহ, তা নয়। আশ্রমবাসিনী ঋষিবধূর শরীর থেকে উদভাসিত হত এক বন্য সৌন্দর্য। মেয়েটির সরল মুখে যেন ছুঁয়ে থাকত বিষাদের অপার লাবণ্য। আর এই লাবণ্য এবং বন্য সৌন্দর্যই যেন তাকে অমোঘ আকর্ষণে ডাক দিত দিনের পর দিন।

সবুজ আশ্রমের মাঝে মাটির কন্যা যেন অহল্যা। এতো পবিত্র, এতো সুকুমার এত অসহায় যে ইন্দ্রের মনে হত এই আরণ্যক কন্যাকে হৃদয়ের সিন্দুকে সযত্নে আগলে রাখা উচিত।

(সাত)

প্রথম সাক্ষাতের পর প্রায় প্রতিদিনই দেখা হতে থাকে দু'জনের। আশ্রমের নিভৃত গহন নীরবতার মাঝে আকুল প্রেমে দিন রাত এক হয়ে যেতে লাগল।

সেদিন অঝোর বৃষ্টি ঝরে চলেছে রাত হতে সারাদিন। আশ্রমের প্রতিদিনের অনুশাসনে কোনো শিথিলতা নেই। ভোর হতে না হতেই মহর্ষি গৌতম কুটির হতে যাত্রা করেছেন নিজের জপ ধ্যানের উদ্দেশ্যে। সারাদিন ব্যস্ত থাকেন তিনি। এই একটি আশ্রম নিয়ে পড়ে থাকলে তাঁর চলে না, তিনি হলেন ঋষি সমাজের প্রধান। এখন আর্যাবর্ত নতুন নতুন সমস্যায় জর্জরিত। বিশেষ করে নীচ অনার্য জাতির অত্যাচারে ত্রাহিরব উঠছে বিভিন্ন আশ্রমে। এই সমস্ত বনচর জাত, আচরণ যাঁদের রাক্ষসের মত, তারা ভয়ানক উৎপাত শুরু করেছে। অরণ্য নাকি তাদের। সেখানে এসব চলবে না। এই হোম যজ্ঞ বেদ পাঠ ... এগুলি না কি তাদের জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটায় ! এমন সমস্ত অপ উক্তি করে চলেছে তারা ঋষি সমাজের বিপক্ষে। বেদ পাঠ করে না যারা, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার কিসের ? এই সমস্ত অন্যায়ের বিচার চাইবেন কার কাছে ? দেবতাদের রাজা ইন্দ্র আজকাল প্রায়ই তাঁর আশ্রমে আসা যাওয়া করছে। লক্ষ্য অবশ্যই কোনো সুন্দরী ঋষি পত্নী হবে। এই রকম একজন ব্যক্তির কাছে সাহায্য পাওয়ার কোনো আশা নেই। মহর্ষি গৌতম চিন্তিত। খুব চিন্তিত। একমাত্র উপায় কোনো ক্ষত্রিয় রাজা। খোঁজ নিতে হবে, এই মুহূর্তে এমন কোনো রাজা আছেন কি না যিনি সম্মত হবেন এই হিংস্র অশিক্ষিত বর্বরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ? ঘরে বাইরে অশান্তি এখন গৌতমের। পত্নী অহল্যা সর্বক্ষণ অন্যমনস্ক। পূজার জোগাড় করতে গিয়ে নিয়ত ভুল করছে। দিন কয়েক নির্বাসনে থাকায় বাইরের স্বভাবটি এখন শান্ত। সেই উচাটন ভাবটি আর নেই। পরিবর্তে এসেছে উদাসীন ভাব। শরীর এখানে মন যেন অন্য কোথাও। বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্যা ... এ যেন সাক্ষাৎ অগ্নি পুষে রাখা তৃণকুটিরে ! যাকগে যাক। তিনি আর পেরে ওঠেন না। কমণ্ডুল হাতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললেন অরণ্যের গভীরে।

(আট)

ইন্দ্র ভেজা যুথির মালা হাতে, দীন প্রেমিকের মতো অহল্যার কুটিরদ্বারে উপস্থিত। সেদিন, দু'জনেই বড়ো নীরব। ইন্দ্রের বুকে লুটিয়ে আছে প্রিয় নারী। বাইরে বৃষ্টি থামার যেন লক্ষণই নেই। কত যে সাধারণ কথা, কত যে তুচ্ছ

কথা, কথা যেন শেষই হতে চায় না! সারা দুনিয়ায় যেন আর কেউ নেই। কিছু নেই। শিশুহরিণের হর্ষ শোনা যায় না। পাখিরা যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। নিজের অজ্ঞাতসারে অহল্যার কম্পিত অধরে অস্ফুটস্বরে প্রার্থনার মতো শব্দ বেরিয়ে আসে, 'তুমিই আনন্দ, তুমিই এক, তুমি সর্ব। আর সব মিথ্যা।'

নারীর নগ্ন শরীরে ময়ূর পালক বোলাতে বোলাতে ইন্দ্র বলে উঠলো – "ঋষি গৌতমের ক্রোধ জ্বলন্ত আগুনের মতো। আমাকে রক্ষা করার জন্য আছে পুরো দেবসমাজ। তোমার কি হবে অহল্যা ? তোমার সমাজ সম্মান সব নষ্ট হবে যে !"

– "দেবরাজ।" মুদিত নয়নে অস্ফুটে অহল্যা বলে, "ভয় এতদিন ছিলো। যখন ভালোবাসা জানিনি। আজ বাইরের আবরণের সঙ্গে সঙ্গে সরে গেছে সব ভয়। আমার কি মনে হয় জানো দেবরাজ ?"

– "আগে তুমি ঐ দেবরাজ ডাকা বন্ধ করো। আমি এক ভিখারী তোমার প্রেম ভিখারী। এই প্রেম আমার আশ্রয়।"

মুদিত চোখের কোল বেয়ে ঝরে পড়া জল ভিজিয়ে দিচ্ছিল ইন্দ্রের করতল, নারী চোখ মেলেনা। মৃদু ভেজা কিন্তু দীপ্ত কণ্ঠে বলে, "আমার মনে হয়, এতদিন পাপ করছিলাম আমি। নিজেকে প্রতারিত করাও পাপ। আজ যদি এই সত্য প্রকাশ হয় হোক। ভালোবাসার সামনে অভিশাপ নতজানু হবেই।"

প্রেম অথবা কাম ... সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার। সমাজের অনুশাসন প্রথমেই শৃঙ্খলিত করল ওই দুটিকে। মুক্ত মন বন্দী খাঁচায়, সে মন ব্যাধি আক্রান্ত হবেই। অবদমিত কাম বহুরোগের আধার।

আকস্মিক ভাবে মহর্ষি গৌতম প্রবেশ করলেন কুটিরে। কিছু নিতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। হতচকিত প্রেমিক প্রেমিকা। নিজেদের সামলানোর সুযোগ পেল না। বিস্ময়ে হতবাক ঋষি নিজেও।

তাঁর পবিত্র কুটিরে, তাঁর পুণ্য শয্যায় ... ছি ছি ... সম্পূর্ণ নগ্ন ... অহল্যা পাপীয়সী ! নাহ। নাহ। ক্রোধ নয়। ক্রোধ নয়। লোক জানাজানি কিছুতেই না।

কমন্ডুল থেকে জল ছিটিয়ে নিলেন মুখে চোখে। তীব্র অপমান পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে এখন। তাঁর উচ্চারিত একটা শব্দে টুকরো হয়ে মাটিতে মিশে যাবে ঐ চরিত্রহীন লম্পট দেবরাজ। কি রকম ভীরু খরগোশের মত আচরণ করছে, দেখো! হিমশীতল কণ্ঠে বললেন, "এত সাহসী প্রেমিক। তস্করের মত লুকিয়ে লুকিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হও, ভাবতে পারো নি এভাবে ধরা পড়বে, তাই না ?

ইন্দ্র কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তিনি গলা নামিয়ে ধমক দিলেন, "স্তব্ধ হও। অহল্যার অঞ্চলের আশ্রয় ছেড়ে মুখোমুখি এসো। তুমি যে কতখানি ভীত, সে তোমার মুখে ফুটে উঠেছে দেবরাজ। নিজের কৃতকর্মের জন্য নিজেকেই ঘৃণা করবে এরপর থেকে। এমন অভিশাপ দেব, যে খসে পড়বে অন্ডকোষ। আর কোনোদিন পরস্ত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাবে না, কাপুরুষ প্রেমিক।

কুটিরের এক কোনে চুপ করে বসে ছিলো অহল্যা। শিশির স্নিগ্ধ শিউলির মত। ঋষি অবাক হলেন। মেয়েটির সর্বাঙ্গে এক স্বতঃস্ফূর্ত সততা ফুটে উঠছে। চোখ দুটি খোলা। ঋষি বললেন, "দেখো অহল্যা। তোমার নায়ক কেমন ভীত।" উত্তরে মৃদু হেসে অল্প মুখ তুলে বলে, "ভয় আপনাকে নয়, আপনার ওই অভিশাপকে ভয় পাচ্ছেন দেবরাজ। তপস্যা লব্ধ এই ক্ষমতার ব্যবহার আপনি করবেন , জানা কথা। ভয় সেখানে।"

– তার মানে ? অদ্ভুত কথা বলো তুমি। ঘৃণিত কৃতকর্মের দন্ড অনিবার্য।

– কোনো পাপ আমরা করিনি ঋষিবর। আমরা ভালোবাসি পরস্পরকে। যদি এই মুহূর্তে নিজের অনুশাসন শিথিল করেন, প্রত্যাহার করেন দন্ড... আমরা হাতে হাত রেখে ত্যাগ করব আপনার কুটির।

– এত বড় আস্পর্ধা!

ক্রোধে হতাশায় অপমানে নিরুপায় ঋষি মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত নিয়ে এলেন অহল্যার কাছে। ভীষণ চোখে তাকালেন তিনি স্ত্রীর দিকে। আশ্চর্য! দ্বিচারিনী বা অসতী বোধ কেন জাগছে না এই নারীর? ভয় না পেলে তো চলবে না। আহল্যার সত্য প্রকাশ হলে, ঋষিসমাজে তাঁর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। তবে কি একটু কাকুতি মিনতি করে দেখবেন ? ইন্দ্র এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, "এখন স্বামী স্ত্রীর কথা হবে। তুমি যাও। না হলে ...!

পরিস্থিতি জটিল। ইন্দ্র ভালোই বুঝতে পারছে সে কথা। থাকলে জটিলতা আরো বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান হওয়াই উপযুক্ত। অহল্যার দিকে তাকানোর ক্ষমতা আর নেই। তবু বলতে গেল কিছু একটা, মৃদু স্বরে অহল্যা বলে উঠল, "আমার কর্মের দায় আপনার নয় দেবরাজ। অন্ধকার গুহা থেকে মুক্তি দিয়েছেন আপনি। সে মুক্তি কাম্য ছিল আমার। এ চাওয়া একান্ত আমার নিজের। ফিরে যান অমরাবতী।

(শেষপর্ব)

দুজন প্রতাপশালী পুরুষের চোখের সামনে উন্নতশির জ্বলন্ত প্রদীপের মত স্থির হয়ে রইল অহল্যা। ঋষি গৌতমের অভিশাপকে ভয় পায়নি, প্রেমিক ইন্দ্রের পলায়ন দেখে দুঃখ পায়নি, নিজেকে এতটুকু করুণা করেনি।

নাহ। সে মিথ্যা বলবে না। ইন্দ্র তাঁকে ধর্ষণ করেনি। স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে সে। কিছুতেই মিথ্যা বলবে না। কুটিরের মধ্যে বন্দী সিংহের মত গর্জন করেন ঋষি। উন্মত্ত ক্রোধ দমন করে পদচারণা করতে করতে বলেন:

শোনো অহল্যা, পাপ তুমি করেছ। তোমার সমস্ত পাপ আমি গোপন করে আবার স্ত্রীর মর্যাদা দেব। তুমি শুধু স্বীকার করো, দোষী হল ইন্দ্র।

– পাপ? আমার পাপ? আর আপনার পাপ নেই? আমি যদি পালন না করে থাকি পত্নীধর্ম, তবে আপনিই বা কোন পতিধর্ম পালন করেছেন ? উত্তর দিন ?

– নারীর মুখে এমন প্রশ্ন শোভা দেয় না। একথা বোঝো তুমি ?

– নারীর মুখে কোন কথা শোভা দেয় তবে ? ঘর গেরস্থালি, সন্তান পালন ... এই সমস্ত ? শরীর ধর্ম পালন করা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে ঋষিবর।

আমি সেই ধর্ম পালন করেছি। কোনো পাপ করিনি।

তিনভুবন নাহ্। কোনো পুষ্প বৃষ্টি হয় নি। স শরীরে স্বর্গেও যায় নি অহল্যা। নিজেকে সরিয়ে নিল সে। চার দেওয়ালের বন্ধন থেকে অনেক দূরে একলা। স্বাধীন। সত্যে অবিচল কঠিন পাষাণের মত।

নোট : ১ – অহল্যার অর্থ, চাষ হয়নি এমন জমি। রামচন্দ্র এসে ঐ জমি চাষ করলেন। অর্থাৎ, অহল্যা কে উদ্ধার করলেন। পুরাণে, পঞ্চসতীর মধ্যে অহল্যার নাম সবার প্রথমে আছে। কেননা, ভালোবাসা কোনও পাপ নয়। পাপ হল, তাকে লুকিয়ে রাখা। সেই অর্থে, অহল্যা অন্তর থেকে, এক পুরুষগামিনি। দেবরাজ ইন্দ্রতেই সে সমর্পিত প্রাণ। তাই সে অসৎ নয়। সে সতী।

প্রণাম অহল্যা ।প্রণাম তাঁর ভালোবাসাকে।

নোট : ২ – গৌতম-পত্নী অহল্যা পাথর হয়েছিলেন। রামের চরণ স্পর্শে তিনি মনুষ্য শরীর লাভ করলেন। এ রকম অলৌকিক বর্ণনা মূল রামায়ণে নেই। অহল্যা আসলে পাথর হয়ে যাননি। অন্যকে দেখা না দিয়ে, লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে, কঠোর ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করেছিলেন।

এই কথাই, বাল্মীকি রামায়ণে আছে।

দেবশ্রী মিত্র

সিদ্ধার্থ মায়াদেবীপুত্র

দেবদহের জনপদাধিপতির ভবনে আজ আনন্দের অন্ত নাই। মালিনী ফুলের সাজি ভরে ফুল আনছে, সেই সাজি ভরে রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে ফিরছে। দাসদাসীদের সকলেই সকাল সকাল পাঁচ কার্ষাপণ দান পেয়েছে। ব্রাহ্মণরা আসছেন মঙ্গলবচন পড়তে, ঝুলি ভরে দক্ষিণা নিয়ে যাচ্ছেন। ভবনদুয়ারে কাঙাল ভিখারির ভিড়, জনপদাধিপতি সুভূতি স্বয়ং নব্যবস্ত্র, খাদ্য দান করছেন তাদের। এদিকে ভবন সেজে উঠছে ফুলে আর প্রদীপে, তার তদারক করছেন সুভূতিপত্নী। বিখ্যাত শাক্য বংশের কুমার শুদ্ধোদনের জন্য সুভূতিদুহিতাদ্বয়ের পাণিপ্রার্থনা করে পত্র পাঠিয়েছেন রাজা সিহাহনু। কোথায় শাক্যকুমার, কোথায় দেবদহের সামান্য জনপদকন্যা ! বিশেষ সকলেই জানেন যে কুমার শুদ্ধোদন শীঘ্রই যৌব্যরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন, বিবাহের বিলম্ব মাত্র। কুমার অতি সুপুরুষ, চরিত্রবান, ধুরন্ধর যোদ্ধা। কন্যার পিতার আর কীই বা কামনা থাকতে পারে!

এত আনন্দের মধ্যে কন্যাদের দেখা নাই, তারা নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে, আশীর্বাদী ফুল দূর্বার অংশবিশেষ মাথায় ধারণ করে পিতৃগৃহের ছাদে ইতিউতি ঘুরে বেড়ায়। বড়জন, মায়া, শান্ত-সমাহিত বিশালাক্ষী সুন্দরী, তার মুখে বাক্য সরে না। থেকে থেকে তার চোখ জলে ভরে আসে। ছোটজন, মহাপ্রজাপতি, সে প্রজাপতির মতই উচ্ছ্বল, চোখমুখে তার খুশি লুকোনোর অক্লান্ত প্রয়াস। সে দিদিকে জড়িয়ে ধরে বলে,

– আহা, মন খারাপ করিস না। দুজনে এক জায়গায় থাকতে পাবো, এইই বা কম কী ?

– শাক্যবংশে এর আগে কখনো বহুবিবাহ হয় নি। বহুবিবাহ অতি লজ্জার কথা গোতমী, তুই কি কিছুই বুঝিস না ?

– কিসের লজ্জা বল তো ! তুই কি আমায় হিংসা করবি, না আমি তোকে ? বিশেষ শুনলিই তো পত্রে কী লিখেছেন মহারাজ !

– শুনলাম। শুনেও তোর খারাপ লাগে নি ?

– না, লাগে নি। শাক্যগুরু গণনা করে বলেছেন আমাদের মধ্যে কারো একজনের গর্ভে মহাতেজা জগৎজয়ী পুত্র জন্ম নেবেন, তাই কুমারের জন্য দুজনেরই পাণি প্রার্থনা করেছেন মহারাজ। এতে অপরাধ কী ?

– জগৎজয়ী পুত্র চাই না আমার।

– বেশ নাহয় আমারই হবে পুত্র। তুইই বা এত ভাবিস কেন আগে থেকে ?

মায়ার কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে গোতমীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

– শুনিস নি, রাজ্যজয় করে এসে পিতার থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়েছেন কুমার দুই কন্যা বিবাহ করার ? ওনার পছন্দমাফিক জগৎকে তরবারি দিয়ে বশ মানানো পুত্র চাই! আমার চাই না। যে জগৎবিজয়ী উত্তরাধিকারীর জন্য দুই কন্যা বিবাহ করতে পারে, তাঁর সন্তান গর্ভে ধরেই বা কী লাভ !

– তুই কী রে ? কুমার অতি সচ্চরিত্র, দেখিস নি গতবার তীরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ? জগজ্জয়ী পুত্র চাওয়া কি অপরাধ ?

– আমার কী চাই বিবাহপূর্বে তাও তো জানা জরুরি।

– কী চাই তোর ?

– অনন্যমনা পতি। প্রেমময় পুত্র। যে ভালোবাসা দিয়ে জগৎ বশ করতে পারে, এমন সন্তান চাই আমার।

*** *** ***

কিন্তু বিবাহকালে কন্যার মত জিজ্ঞাসা করার নিয়ম নাই, বিশেষ বিবাহপ্রস্তাব যদি রাজবংশ থেকে আসে। তাই যথাসময়ে মায়া আর গোতমী, দুই কন্যার সঙ্গেই বিবাহ সম্পন্ন হয় সিহাহনুপুত্র শুদ্ধোদনের। দেখতে দেখতে কেটে যায় বিবাহ-পরবর্তী বিশ বছর। শুদ্ধোদন কুমার থেকে মহারাজ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু তিনি এখনো অপুত্রক। শাক্যবংশে বহুবিবাহ একেই নিন্দনীয়, তায় তিনি ইতিমধ্যেই দুই ভগ্নীকে বিবাহ করেছেন বিধায় পুনরায় বিবাহের কথাও আর ওঠে না। প্রাসাদে রাজমাতা থেকে মন্ত্রণাকক্ষে মহামন্ত্রী, সাধারণ প্রজা থেকে রানী গোতমী, সবারই মনে মনে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একমাত্র মহারানী মায়াদেবীই অবিচল। তাঁর মনের হদিশ পায়, এমন সাধ্য কারো নেই। ভগ্নী গোতমী অবধি "আয় দিদি, লজ্জাগৌরী পূজা করি।" বলে বলে হার মেনেছেন। মায়াদেবী নিষ্ঠুরের মত বলেন, গুরুদেবের বিধান, জগজ্জয়ী পুত্র তো হবেই। তবে আর পুজো করে কী হবে ? তিনি কনিষ্ঠা রানী, দিদি না অনুমতি দিলে তাঁরও আর বিধিমতে পূজা করা হয়ে ওঠে না।

জনপদসংঘ অবধি যখন ভাবতে শুরু করেছে রাজার উত্তরাধিকারীর কী হবে, মহারাজকে পুত্র দত্তক নিতে বলা সমীচীন হবে কিনা, হেনকালে শোনা গেল মহারানী মায়াদেবী অন্তঃসত্ত্বা ! রাজ্য জুড়ে আনন্দের রোল পড়ে গেল। এক পক্ষকাল ধরে রাজ্যে উৎসব ঘোষিত হল। ভিখারি কাঙালি খাবার না খেতে পেরে বিলিয়ে দিতে লাগলো। ব্রাহ্মণীদের পঁইচার ওজন দ্বিগুণ হল। উত্তরে রানীদের পিতৃগৃহ থেকে থরে থরে উপহারসম্ভার এল। আলোয়, আনন্দে, রোশনাইতে কপিলাবস্তুতে দুখের লেশমাত্র রইলো না। শুধু মহারানী মায়া এত আনন্দ, এত আলো থেকে দূরে পূজাগৃহে নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন। ভগিনী গোতমী এসে আনন্দে দিদিকে আলিঙ্গন করেন, "দিদি, রাজগুরু বলেছেন এই সন্তান মহামতি হবেন, জগৎ জয় করবেন।" শান্ত স্বরে মায়াদেবী উত্তর দেন, "জানি। শ্বেতহস্তী শ্বেতপদ্ম শুঁড়ে নিয়ে আলিঙ্গন করেছিল আমায়। নিষ্কলুষ শ্বেতহস্তী!" রাজা শুদ্ধোদন মায়াদেবীকে রাজকাননে বসিয়ে রেখে তীরন্দাজী অভ্যাস করেন, পুত্র তাঁর মহাধনুর্ধর হবে এককালে। মায়াদেবী সদ্যপ্রোথিত চারাগাছগুলির পরিচর্যা করেন, মালীকে ডেকে বলেন, মহীরুহের কোন শাখাগুলি কাটা বারণ, কারণ তাতে কপোত কপোতী বাসা বেঁধেছে।

এইভাবে কেটে যায় গর্ভধারণের নয়মাস। সন্তান জন্মের অব্যবহিত পূর্বে মায়াদেবী পিতৃগৃহে যাত্রা করেন। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনোর পূর্বেই লুম্বিনীতে মায়াদেবী পুত্রের জন্ম দেন। পুত্র জন্মের অনতিবিলম্বে মায়াদেবী ভয়াবহ সূতিকা জ্বরে আক্রান্ত হন। ভগিনীর অসুস্থতার খবর পেয়ে গোতমী আসেন লুম্বিনীতে তড়িঘড়ি। পুত্রের সপ্তদিবসে গোতমীর হাতে পুত্র সমর্পণ করে চোখ বোজেন মায়াদেবী। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্রের নামকরণ করে যান সিদ্ধার্থ। যার জন্মের অর্থ সিদ্ধ হয়েছে। নামকরণ মুহূর্তে যখন আসন্ন ভগিনী বিচ্ছেদ আশংকায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন রানী গোতমী, ডানহাত পুত্রের মাথায় রেখে নিজের জীবনের শেষ বাক্য উচ্চারণ করেন বুদ্ধমাতা, সাম্যচিত্ত হও। আত্মোদীপ হও। সিদ্ধার্থ হও।

*** *** ***

রানী গোতমী রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে মহারাজ শুদ্ধোদনকে মহারানীর শেষ ইচ্ছা শোনান অশ্রুবিগলিত চোখে।

মায়াদেবী অন্তিম মূহুর্তে কুমারকে আশীর্বাদ করেছেনঃ সাম্যচিত্ত হও।

রাজা প্রাসাদ ঘিরে দেওয়াল গাঁথেন, যাতে প্রজার দুঃখ পুত্রের চোখে না পড়ে।

আশীর্বাদ করেছেনঃ আত্মোদীপ হও।

রাজা পুত্রের প্রতিটি ক্ষণ ভরিয়ে দেন দেশবিদেশের নামীদামী শিক্ষক দিয়ে। কেউ বা শেখায় বেদ-পুরাণ, কেউ বা অস্ত্রবিদ্যা।

রানী আশীর্বচন উচ্চারণ করেছেনঃ সিদ্ধার্থ হও।

ক্রোধে অগ্নিশর্মা রাজা পুত্রের নাম বদলান। বাহিরে রাজসুলভ ক্রোধ সংবরণ করে গোতমীকে বলেন, আজ থেকে কুমার তোমার পুত্র, ওর নাম হবে গৌতম।

কুমার গৌতমের দিন কাটে বাঁধা গতে, জগজ্জয়ী রাজা হয়ে ওঠার শিক্ষায়। রাজা শুদ্ধোদন গৌতমকে প্রতিদিন একটু একটু করে নিজের মনের মত হয়ে বেড়ে উঠতে দেখেন আর ভাবেন, ভাগ্যিস মায়া বেঁচে নেই ! ভাগ্যিস গৌতম ছোটরানীর হাতে মানুষ !

তারপর একদিন, কোন এক বর্ষার রাতে, কুমার গৌতম রাজা শুদ্ধোদনের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে যাবে সাম্যচিত্ত হতে, আত্মদীপ হতে, সিদ্ধার্থ হতে। ক্রমে সঙ্গে নিয়ে যাবে শাক্যকূলের সকল উত্তরাধিকারীকে একে একে, নন্দ এবং রাহূলকেও। পিছনে রেখে যাবে একা বৃদ্ধ শুদ্ধোদনকে সিংহাসনে বসে মৃত্যুর অনন্ত অপেক্ষা করার জন্য। সেই অখণ্ড অবসরে মহাপরাক্রমী রাজা শুদ্ধোদন কখনো ভাববেন কি, গৌতম শাক্যকুমার শুদ্ধোদনপুত্র সিহাহনুপৌত্র মাত্র ছিল না। সে কৌলীয়কন্যা বিশালাক্ষী মায়াদেবীরও পুত্র ছিল !

সে মায়াদেবীরই পুত্র ছিল !

সুজয় দত্ত

সার্ভিস

হঠাৎই ভাদ্রের এক গুমোট সকালে আলাপ হয়েছিল ছেলেদুটোর সঙ্গে। আমি তখন সদ্য রিটায়ার করেছি। এতদিন দক্ষিণ কলকাতার এক বর্ধিষ্ণু শহরতলীতে ভাড়াবাড়ীতে কাটিয়ে নিজের সারাজীবনের সঞ্চয় ঢেলে দমদম এলাকায় একটা ছোট দুকামরার ফ্ল্যাট কিনেছি। দক্ষিণ থেকে একেবারে উত্তরে চলে আসার উদ্দেশ্য আমার ছোট ছেলে-বৌয়ের কাছাকাছি থাকা। নতুন একতলা বাড়ীতে মোট চারটে ফ্ল্যাট, রাস্তার দিকেরটা আমার, বাকী তিনটেয় তখনো লোক আসেনি। অল্প কিছুদিন পর আমার পাশের ফ্ল্যাটটায় এসে উঠলেন দস্তিদার বাবুরা। রানীকুঠিতে থাকতেন, টালিগঞ্জের দিকে একটা ব্যাংকে বড় অফিসার ছিলেন, এখন সেই ব্যাংকেরই দত্তপুকুর ব্র্যাঞ্চে ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন। বয়সে আমার চেয়ে অনেকটাই ছোট, চুলেটুলে পাক ধরেনি তেমন। আমরা এখানে এসে ওঠার পর প্রথম কিছুদিন নাগেরবাজারে ছোটছেলের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করছিলাম। মুভিং কোম্পানী সব জিনিসপত্র দিয়ে গেছে, কিন্তু প্যাকিং-ট্যাকিং তখনও খোলা হয়নি। তাছাড়া রান্নার গ্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে তো নতুন জায়গায়। আমার তো নাম লেখানো সেই বৈষ্ণবঘাটার ইন্ডেন ডীলারের কাছে। আর cable টিভি, ল্যান্ডলাইন ফোন এগুলোও চালু করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমার গিন্নীর আবার সন্ধ্যেবেলায় বাংলা সিরিয়াল আর ট্যালেন্ট শো গুলো না দেখলে ভাত হজম হয়না।

এমন সময় একদিন সকালে জলখাবার খেয়ে বেডরুমের লাগোয়া একফালি বারান্দাটায় খবরের কাগজ নিয়ে একটু বসতে যাব, কানে এল পাশের ফ্ল্যাটের দস্তিদারবাবু কাদের সঙ্গে যেন কথা বলছেন। ভদ্রলোকের গলাটা একটু বাজখাঁই গোছের, তাই মোটামুটি পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

– "হ্যাঁ, আমি এখানে নতুন এসেছি, কাউকে চিনি-টিনি না, এখুনি চাঁদা-টাদা দিতে পারছিনা।"

– "না স্যার, চাঁদা নয়, মানে আপনার কোনো সার্ভিস লাগবে কিনা সেটাই –"

– "সার্ভিস ? সে তো অনেককিছুই লাগবে। ড্রইংরুমের পাখাটা কাজ করছে না, একজন ইলেট্রিশিয়ান লাগবে। রান্নাঘরের সিঙ্কটা দিয়ে জল যাচ্ছেনা, একজন কলের মিস্তিরি লাগবে। বাড়ীতে একটা ঠিকে কাজের লোক লাগবে। তা, কী করা হয় ?"

– "ইয়ে, মানে, আমি এ-পাড়ায় সকলকে গ্যাস দিই।"

– "হুঁ, সে তো চেহারা দেখেই আন্দাজ করা যায়। লোক ঠকিয়ে খাও।"

– "না স্যার, মানে বলতে চাইছি, আমি এ-পাড়ায় ইন্ডেন গ্যাস সিলিন্ডারের ডিস্ট্রিবিউটার। আপনি কি –"

– "ওঃ, তাই বল। আর এই ছেলেটি কী করে ? এই যে, অ্যাই, তুমি কী কর ?"

– (একটা মিহি গলা) "আমি স্যার বাড়ী-বাড়ী ফোন লাগাই।"

– মানে ? কাজ নেই কম্মো নেই সারাদিন বসে বসে লোককে ফোন করে বিরক্ত কর ?"

– "না না না, তা বলিনি, আমি সবার বাড়ীতে ল্যান্ডলাইন ফোনের কানেকশান দিই। কেবলেরও দিই স্যার। আপনার টিভিতে –"

– "অ। আই সী। নাম কী তোমাদের ?"

– "ইয়ে, আমি প্রদীপ, ও অশোক। আপনি আমাদের কাল্টু আর ঝন্টু বলেই ডাকবেন স্যার। পাড়ার সবাই তাই –"

– "কী বলে ডাকব সেটা পরের কথা। লাইসেন্স আছে তোমাদের ? দেখাতে পার ?"

– "ইয়ে, মানে, না তো স্যার, সঙ্গে তো নেই এখন। আপনাকে পরে এনে –"

– "ঠিক এই জিনিসটাই আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। ট্রাভেলিং সার্ভিস প্রোভাইডার হয়েছ আর সঙ্গে লাইসেন্স রাখ না? আজকালকার দিনে হু উইল ট্রাস্ট ইউ ?"

আমি এতক্ষণ শুনছিলাম আর হাসছিলাম। এরকম জাঁদরেল ব্যাংক অফিসারের পাল্লায় পড়লে এই হাল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এবার একটু নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াতে হল। অফিসারবাবু যদি লাইসেন্স নেই বলে বকেঝকে ওদের ভাগিয়ে দেন, ওঁর নিজের খুব একটা অসুবিধে হবেনা হয়তো। আফটার অল ইয়ং ম্যান। কিন্তু আমার হবে। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে "হ্যাঁগো কোথায় গ্যাসের অফিস গো ? হ্যাঁগো কোথায় কেবলের অফিস গো ?" করা আমার পোষাবেনা। তাই তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলে এতক্ষণ যেন কিছুই শুনিনি সেইভাবে বললাম, "কী ব্যাপার অমিতেশবাবু ?"

– "আরে এই দেখুন না, সক্কালবেলা কলিং বেল টিপে বিরক্ত করতে এসেছে –"

– "অ্যাই, খামোখা স্যারকে বিরক্ত করছো কেন তোমরা ?" আমি কপট শাসনের ভঙ্গীতে ধমকাই, "এস, এদিকে এস, কী চাই আমায় বল। অমিতেশবাবু, আপনি কাজ করুন, আমি দেখছি এদের।" বলেই সটান ওদের আমার ফ্ল্যাটে চালান করে দিলাম। তারপর নীচুগলায় বললাম "শোনো বাবারা, তোমরা ইন্ডেন আর কেবলের লোক তো ? বেশ বেশ। এখন বল আমার এই ফ্ল্যাটে ডবল সিলিন্ডার আর স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো পেতে আমায় ঠিক কী করতে হবে। আর তোমরা কত নেবে।"

– "আপনি কিস্সু চিন্তা করবেন না দাদু, ইয়ে, মেসোমশাই।" ওরা একগাল হেসে বলল, "আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। আপনি শুধু একটু ফ্রমট্রমগুলো ফিলাপ করে দেবেন। আর টাকার কথা পরে, আগে কাজ হোক। কাজটা দেখে নিন।"

সেই শুরু। তারপর এতগুলো বছর কেটে গেছে। কাল্টু-ঝন্টু আর শুধু সার্ভিস প্রোভাইডার নেই, প্রায় আমাদের বাড়ীর ছেলেই হয়ে গেছে। কত ব্যাপারে যে সাহায্য করে এই বুড়োবুড়িকে। যা ওদের করার কথাই না। ইলেক্ট্রিসিটি আর ট্যাক্সের বিল জমা দিয়ে দেওয়া, মোবাইল ফোন খারাপ হয়ে গেলে দোকান থেকে সারিয়ে এনে দেওয়া, মল রোডের মোড়ের ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ এনে দেওয়া, গ্যাস ওভেনটা গন্ডগোল করলে বাড়ী এসে পরিষ্কার করে দেওয়া। আমার চেয়ে আমার গিন্নীর সঙ্গেই ওদের জমে বেশী। মাঝেমাঝেই মাসীমার হাতের চা এবং তার সঙ্গে বেশ ভালরকম 'টা' খেয়ে যায় ফ্ল্যাটে এলে। আমি যদি কোনো ব্যাপারে বলতে যাই "অ্যাই কাল্টু (বা ঝন্টু), এই সামান্য কাজটায় এতো টাকা চাইছিস কেন রে ?", ওদের মাসীমাই আমাকে ধমক লাগান, "তুমি থামো তো ! ছেলেদুটো রোদে পুড়ে জলে ভিজে কাজগুলো করে না দিলে পারতে তুমি নিজে ?" পরে আমার সুপারিশে দস্তিদারবাবু আর এ-বাড়ীর অন্য দুই ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাও ওদেরই সব কাজকর্ম দেওয়া শুরু করলেন। তবে দস্তিদারবাবু সব ব্যাপারেই একটু বেশী কড়া তো, তাই প্রতিটা পাইপয়সার রশিদ চাওয়া আর কাজের আগে অ্যাডভান্স দেওয়া নিয়ে ওঁর সঙ্গে ওদের একটুআধটু খিটিমিটি লেগেই থাকত। সেগুলো ওরা আবার আমার ফ্ল্যাটে বসে ওদের মাসীমাকে লাগাত।

এমনি করেই দিন কাটছিল বেশ। ঘুরছিল বছর। আমার ব্যাঙ্গালোরবাসী বড়ছেলের মেয়ে কলেজে ভর্তি হল। আমার ছোটছেলের ছেলে মন্টেসরি ছেড়ে প্রাইমারী ইস্কুলে গেল। ওর আবার একটা ছোট্ট টুকটুকে পুতুলের মতো বোন হল। মানে আমরা তৃতীয়বারের জন্য দাদু-ঠাম্মা হলাম। আর তারপরেই এল ২০২০। মার্চ মাস। পৃথিবীজুড়ে দুরন্ত মহামারী শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। সবাই দিশাহারা, সবাই হাতড়ে হাতড়ে বাঁচার রাস্তা খুঁজছে। আমার দেশ, আমার রাজ্য, আমার শহর – কেন জানিনা ভেবেছিল কোনো অলৌকিক জাদুবলে বা অজানা শক্তির জোরে অল্পের ওপর দিয়ে রক্ষা পেয়ে যাবে। হয়তো মারণজীবাণুর অপ্রতিরোধ্য ধ্বংসলীলা এদেশে আসতে একটু দেরী করেছে, তাই জেগেছিল এই অবুঝ আশা। ফলে সর্বোচ্চ প্রশাসন থেকে শুরু করে আমজনতা – প্রথমদিকে সবাই গড়িমসি করেছে, গাফিলতি করেছে। এবং পরে তার ফল ভুগেছে হাজারে হাজারে, অযুতে অযুতে। লকডাউনে বাড়ী বসে বসে টিভিতে আর মোবাইলে যত খবর পেতাম, ততই ভাবতাম এবারে বোধহয় দিন ঘনিয়ে এল আমার, কারণ চারিদিকে সবাই বলছে আমার বয়সী কারোর এ-জিনিস একবার হলে আর পরিত্রাণ নেই। এইভাবে বন্দীদশায় প্রায় আড়াই মাস কেটে গেল। কাল্টু-ঝন্টুর এখানে আসা অনেকদিন বন্ধ হয়ে গেলেও মোবাইলে যোগাযোগ আছে ওদের সঙ্গে। একসময় নানা দিক থেকে আসা রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক চাপে সরকার উঠিয়েই দিল লকডাউন। কিন্তু এমনসময় ওঠাল, যখন মহামারীর আগুন স্তিমিত হয়ে আসার বদলে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এবার সেই আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। উপায়ান্তর না দেখে আমাদের এই শহরকে ভাগ করা হল গ্রীন, ইয়েলো, অরেঞ্জ আর রেড জোনে। রং যত লালের কাছাকাছি, সেই জোনের অধিবাসীদের চলাফেরা আর স্বাভাবিক জীবনযাপনের ওপর তত কড়া নিষেধাজ্ঞা, কারণ সেখানে সংক্রমণের মাত্রা তত বেশী। আমাদের এই এলাকাটা অরেঞ্জ জোন।

ঠিক এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যে আর গ্যালারীতে দর্শক হয়ে দূরে বসে দেখতে পারলাম না এই মৃত্যুলীলা। মাঠে নেমে পড়তে হল এই বাড়ীর বাসিন্দাদের। মানে আমাকে বা আমার স্ত্রীকে নয় – দস্তিদারবাবুকে। ওঁর বাবা-মা থাকেন সল্টলেকের কাছে নয়াবাদে তাঁদের নিজস্ব ফ্ল্যাটে। সত্তরের কোঠায় বয়স দুজনেরই। বাবা বহুবছর আগে রিটায়ার করলেও মোটামুটি শক্তসমর্থ, কিন্তু মা শুনেছি অনেকদিন ধরে অসুস্থ। দুই ছেলের কেউই কাছে না থাকায় এমনিতে ওঁরা নিজেদেরটা মোটামুটি নিজেরাই চালিয়ে নেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে দস্তিদারবাবু খবর পেলেন ওঁর বাবা-মা যে পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ীটায় থাকেন তার একতলা আর চারতলায় দুটো পরিবারে একসঙ্গে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সারা পাড়া রেড জোন ঘোষণা, পুরো ফ্ল্যাটবাড়ীর সবাই গৃহবন্দী। আর এমনই কপাল ভদ্রলোকের, ঠিক সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা ওঁর মায়ের ফোন এল যে বাবা হঠাৎ বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে গোড়ালি মচকে বিছানায়। পা ফুলে ঢোল, নড়তে চড়তে পারছেন না। বাড়ীতে আর্নিকা আর চুন-হলুদ ছাড়া কিছু নেই। হাড়-টাড় ভেঙেছে কিনা সে তো হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবেনা, কিন্তু করোনার দৌলতে এখন এসব কারণে হাসপাতালে যাওয়ার অনুমতি নেই। কথায় বলে না, দুঃসংবাদ কখনো একা আসেনা ? দস্তিদারবাবু যখন আমার ফ্ল্যাটে এসে এই খবরদুটো দিলেন, বেচারাকে বেশ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। ভাইকে তখনও জানাননি, আর জানালেও সে তো জামশেদপুরে – সেই বা আসবে কী করে ? আমিও প্রথমটা ঠিক কী করব ভেবে উঠতে পারছিলাম না। বিচলিত মুখে উপায় হাতড়াচ্ছি, এমন সময় গিন্নী বলে উঠল, "আচ্ছা, ওই ছোঁড়াদুটো তেলেঙ্গাবাগানের ওদিকে থাকে না ?"

– "কোন ছোঁড়া ?"

– "আরে বাবা, কাল্টু-ঝন্টুর কথা বলছি। ওদের ডিলারশিপ এখানে, কিন্তু মনে হচ্ছে ওরা যেন বলেছিল ঐসব দিকে কোথায় একটা থাকে। ওদের একবার জানালে হয়না ব্যাপারটা ?"

– "বলছ ? যদি সত্যিই তেলেঙ্গাবাগান হয়, ওখান থেকে নয়াবাদ অবশ্য কাছে। কিন্তু ওদের জানিয়েই বা কী হবে ? কী করবে ওরা ?"

দস্তিদারবাবু দেখলাম গিন্নীর এই প্রস্তাবে আশার আলো পেলেন। সায় দিয়ে বললেন, "আই থিঙ্ক ইটস এ গুড আইডিয়া। ইন কেস ওরা ওই এলাকার হয়, পার্হ্যাপস কিছু অ্যাডভাইস দিতে পারবে কীভাবে প্রসীড করা যায় –"

– "বেশ। ওদের ফোননম্বর তো আছে আপনার কাছে, দেখুন যোগাযোগ করে। কী হল আমাকে জানাবেন কিন্তু। চিন্তায় রইলাম।"

– "ইয়ে, মানে, আপনারা একটু কাইন্ডলি যদি করেন, –"

বুঝলাম যাদের সবসময় দাবড়ে কথা বলেন আর লেকচার দেন, হঠাৎ করে তাদের সাহায্যপ্রার্থী হতে বাধছে ভদ্রলোকের। বললাম ঠিক আছে, আমিই করছি, আপনি বসুন। দুজনের নম্বরেই বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর কাল্টুকে পাওয়া গেল। অসময়ে ফোন পেয়ে একটু অবাক, তারপর পরিস্থিতি শুনে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলল, "চিন্তা করবেন না মেসোমশাই। আমাদের কানে তুলে দিয়েছেন, ব্যস, আর কী ? আমি দেখছি কী করা যায়। ও-জায়গা আমি খুব ভাল করে চিনি, আগে ওখানেই ডিলারশিপ ছিল আমার। শুধু স্যারকে জিজ্ঞেস করে একটু ঠিকানাটা যদি বলেন –"

– "বলছি, কিন্তু ঠিক কী করবি তোরা ? ওটা তো রেড জোন।"

– "আপনি নিজে মুখে যখন বলেছেন মেসোমশাই, কিছু একটা তো করবই। একটা মানুষ এরকম গাড্ডায় পড়েছে জেনেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব ? আজ রাতে আর কিছু হবে না, শুধু ঝন্টুর কাকাকে দিয়ে এখানকার পার্টি অফিসে একটা ফোন যদি করানো যায়, নাহলে কাউন্সিলারকে – । ওর কাকার জানাশোনা আছে পার্টিতে – ।"

এর পরের কদিন যা যা করল ওরা দুজনে মিলে, আমার ধারণাই ছিল না ঐ ছোটখাটো চেহারার নিরীহ-নিরীহ দেখতে ছেলেদুটো এতো এলেম রাখে। স্থানীয় পার্টির নেতাদের বুঝিয়ে স্পেশ্যাল পারমিট করিয়ে নেওয়া, সেটা দেখিয়ে রেড জোনে ঢুকে দস্তিদারবাবুর বাবা-মার ফ্ল্যাটের দরজায় তিনদিন অন্তর বাজার পৌঁছে দেওয়া, ডাক্তার ফোনে শুনে গোড়ালির চোটের যেসব ওষুধ দিয়েছিলেন সেগুলো আর ওঁদের অন্য সব নিত্তনৈমিত্তিক ওষুধপত্র একসঙ্গে কিনে দিয়ে যাওয়া, ওঁদের খাবার জলের আকুয়াগার্ড ফিল্টার খারাপ হয়ে গেছে শুনে বিশ লিটারের জলের জেরিক্যান ডেলিভারি দেওয়া, এমনকী মচকানো পা নিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতর চলাফেরা করার সুবিধের জন্য একটা ওয়াকার কিনে আনা – একেবারে নিখুঁত সার্ভিস। আর পুরোটাই করল প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার ফ্ল্যাটে একবারও না ঢুকে, ওঁদের সংক্রমণের কোনো ঝুঁকি না নিয়ে। দস্তিদারবাবু শুধু ঘরে বসে খোঁজখবর রাখলেন আর স্মার্টফোনে টাকা ট্রান্সফার করে গেলেন। এতো খুশী ভদ্রলোক যে আমাদের ফ্ল্যাটে এসে বলে গেলেন, ছেলেদুটো যখন এল্ডারকেয়ার আর ইন-হোম অ্যাসিস্টেড লিভিং সার্ভিসে এরকম পটু, ওঁর ব্যাংক থেকে ওদের লোন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন যদি এই ব্যবসাটা ওরা বড় করে করতে চায়। নাঃ, সে-লোনের আর দরকার হয়নি। দস্তিদারবাবুর বাবা একটু সামলে ওঠার পর ওরা যখন নয়াবাদে যাতায়াত বন্ধ করল, তার কয়েকদিন বাদে ফোন করেছিল কাল্টু। আমাদের রান্নার গ্যাসের দুটো সিলিন্ডারই যে ফুরোনোর মুখে, ঠিক মনে রেখেছে ছেলেটা। বলল অরেঞ্জ জোনে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার পারমিট থাকলে ঢোকা যায়, তাই ও যত তাড়াতাড়ি পারবে একদিন এসে দরজায় নতুন সিলিন্ডার নামিয়ে দিয়ে যাবে। আর অনেকদিন যে মাসীমার হাতের নোনতা হালুয়া বা চিঁড়ের পোলাও খাওয়া হয়নি – সে নিয়ে আক্ষেপ করছে শুনে গিন্নী বললেন বানিয়ে দরজার বাইরে টিফিন কৌটোয় রেখে দেবেন। কথোপকথনের মধ্যে বারবার কাশছিল ছেলেটা। জিজ্ঞেস করতে বলল ও কিছু না, এই সপ্তাহেই দুদিন বাজার করতে বেরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছিল, তাই বোধহয় –

আর কোনোদিন কথা হয়নি ছেলেটার সঙ্গে। আট-নদিন বাদে ও এখনো কেন গ্যাস দিতে এলনা সেটা জানার জন্য ওকে বারবার ফোন করেও না পেয়ে ঝন্টুকে রিং করলাম। ওপ্রান্তে এক বয়স্কা মহিলার গলা – বললেন ছেলে ভীষণ অসুস্থ, ভাইরাসে ধরেছে, তিনটে হাসপাতাল ঘুরেও ভর্তি করানো যায়নি কারণ তারা বেড খালি রাখতে চায় আরো

ভয়ঙ্করভাবে অসুস্থ আর মৃত্যুপথযাত্রীদের জন্য। ওর অতটা খারাপ অবস্থা নয়। আমার পাঁজরের ভেতর হাতুড়ির ঘা, গলা কাঁপছে, তবু কোনোরকমে জানতে চাইলাম, "আর কাল্টু ? সেও কী –"

"আমার ছেলের চেয়েও বেশী ছিল ও, জানেন, ও আমার ছেলের চেয়েও বেশী ছিল –" কান্না আর হাহাকারটা কি ফোনের ভেতর থেকে আসছে, না আমার নিজের বুকের ভেতর থেকে ? গুলিয়ে যায় আমার। "ছিল"? তার মানে – নেই ? কবে, কোথায়, কি বৃত্তান্ত – সেসব জানার কৌতূহল বা শক্তি আমার তখন উধাও। তবু কানে ঢুকল আই ডি হসপিটাল, গত পরশু, বেলা এগারোটায় ভেন্টিলেটরের নল খোলা হয়। এখন আমার যে পিছন ফেরারও সাহস নেই -- কয়েকফুট দূরে উদ্বিগ্ন মুখে যে অপেক্ষা করছে, তাকে আমি এই খবরটা কীকরে দেব? কীকরে দেব তাকে? বেল টিপে দস্তিদারবাবুকে বললাম দু-ছেলের নয়, চার ছেলের বাপ ছিলাম আমি। আজ, এই ঊনসত্তর বছর বয়সে, জীবনে প্রথম পুত্রশোক পেলাম। শুনে নীরব রইলেন ভদ্রলোক, চশমাটা খুলে আস্তে আস্তে হাতে নিলেন। ব্যাংকের অফিসার তো, মাথায় সবসময়েই হিসেব। হয়তো ভাবছিলেন বিনা-অ্যাডভান্স আর বিনা-রশিদে দেওয়া প্রদীপ কর্মকারের এই শেষতম সার্ভিসের ঋণ ঠিক কত জন্মে শোধ করা সম্ভব। আর পিছনে ওঁর ড্রয়িংরুমের টিভির চ্যানেলগুলো তাদের কোভিড সমাচারে হাজার, অযুত, লক্ষের হিসেব দিয়ে যাচ্ছিল অনর্গল।

শাশ্বতী গুহঠাকুরতা

বয়ে চলা সময়ের গল্প

চায়ের পেয়ালা-টা হাতে নিয়ে বাগানে বেতের চেয়ারে এসে বসলো আরতি । বনমালী'কে বলে বলে পিটুনিয়া'র টবগুলো বাগানের ধার দিয়ে সাজিয়ে রাখার নির্দেশ দিচ্ছে । ''রং গুলো সব ছড়িয়ে দে বনমালী, সব সাদা গুলো এক জায়গায় জড়ো করেছিস কেন ? বেগুনি হলুদ গোলাপি কমলা আর ওই দুইরঙা চালিগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে রাখ ।'' এবার বসন্তে অনেক ফুল ফুটেছে । এক মাস আগে থাকতে এসে আরতি, এবার বাড়ির অনেক কাজ করলো । বাগানটাকে'ও সাজিয়ে তুলেছে মনের মত করে । বহু বছর ধরে অনেক সাধ্যসাধনা করার পর মেয়ে জামাইরা অবশেষে আসতে রাজি হয়েছে এবার শান্তিনিকেতনে । আরতির এই পূর্বপল্লীর বাড়ি তার বাবার করা । স্কুলের নিচু ক্লাস থেকেই 'পাঠভবন' এর ছাত্রী সে । তখন অবশ্য বাবা-মা কলকাতাতেই থাকতেন । আরতিকে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন পাঠভবনে ক্লাস টুয়ে । তারপর M.A. পাশ করা পর্যন্ত এই শান্তিনিকেতনেই তার পড়াশোনা । বাড়ি বলতে, শান্তিনিকেতনকেই বোঝে আরতি । ছোটবেলায় স্কুল ছুটি হলে কলকাতায় মা-বাবার কাছে যেত, কিন্তু একলা একলা ভালো লাগে নাকি ? ওই যে দল বেঁধে থাকার অভ্যেস ছোট থেকে, কলকাতার ইঁট কংক্রিটের জঙ্গলে দুদিন পরেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে । স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে যাবার পর মা বলেছিলেন, এবার কলকাতাতেই কলেজ'টা কর । আরতি বলে খেপেছো ? আমি শান্তিনিকেতন ছাড়ছি না । তোমরা ওখানে এসো । রিটায়ার করার কিছু বছর আগে প্রভাত সেন শান্তিনিকেতনে এই বাড়িটি করলেন । আরতি তখন M.A. পড়ছে ।

দিল্লীর ছেলে সন্দীপ, কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে বসন্ত উৎসবে এসে, নাচের প্রসেশনে প্রথম আরতিকে দেখেছিল । একেবারে আশ্রম কন্যা বলতে যা বোঝায় তাই । সপ্রতিভ একটা আলগা শ্রী রয়েছে চেহারার মধ্যে । সন্ধ্যেবেলা গৌর প্রাঙ্গণে চন্ডালিকা দেখতে গিয়ে আবার দেখা ওই মেয়ের সঙ্গে ।

সান্ধ্য বৈতালিকে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা দলবেধেঁ গান গাইতে গাইতে পরিক্রমা করছিল — 'ও আমার চাঁদের আলো/আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে ধরা দিয়েছো'' । সন্দীপ সাহস করে আরতির কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল ''আপনাদের সঙ্গে এই পরিক্রমায় আমরাও কি পা মেলাতে পারি ?'' আরতি বলেছিল ''হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসুন না, গানটা জানা থাকলে গাইতেও পারেন ।'' এই বলে বন্ধুদের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে যায় আরতি । দিল্লী ইউনিভার্সিটির তিন ছেলে মুগ্ধতায় অনুসরণ করে সেই দলকে । তীর্থর মাসীর বাড়ি রতনপল্লিতে, সেখানেই উঠেছে সন্দীপ, তীর্থ আর বাবলু । এই প্রথম শান্তিনিকেতন আসা ।

সন্দীপ'রা প্রবাসী বাঙালি । বাবা আর্মি তে বড় পোস্ট-এ আছেন, মা দুর্গাপুরের মেয়ে । মামাবাড়ির সূত্রে বাংলার সঙ্গে ওইটুকুই যোগাযোগ তার । বছরে এক-আধ বার বুড়ি ছুঁয়ে যাওয়া । দিল্লীর হোলি অন্যরকম । বেদম তামসিক রংখেলা, একদিনের জন্য লাগামছাড়া হুল্লোড়, হোলি বলতে তা'ই বোঝে সন্দীপ । তীর্থ প্রথম আইডিয়াটা দিল । ''চল এবার শান্তিনিকেতনের দোল দেখে আসি, আমার মাসি থাকেন ওখানে, তাঁর বাড়িতেই উঠবো'' । তাই চার দিনের জন্য এখানে আসা ।

বাংলা ডিপার্টমেন্টের ইরার দাদার সঙ্গে কলাভবনের পিয়ালির বিয়ে । সেই উপলক্ষে হোস্টেলের বড়ো মেয়েরা হৈ হৈ করে চলেছে কলকাতায় । দলে তারা পাঁচ জন । বসন্তোৎসবের একদিন পরেই যাওয়া । বোলপুর স্টেশনে ট্রেন থামতেই হুড়মুড় করে উঠে পড়ে সবাই । কোথাও বসার জায়গা নেই । দুএকজন একটু ফাঁক রেখে বসেছে দেখে তাদের অনুরোধ করে একটু চেপে বসতে । উত্তরে শোনা যায়, সেখানে অন্য কারুর জায়গা রাখা আছে । অগত্যা! কামরার আরো ভিতর দিকে এগিয়ে চলে জায়গার খোঁজে ।

আরতিকে দেখতে পেয়েই চমকে ওঠে সন্দীপের মনটা। ''জায়গা পাচ্ছেন না ? আরে এদিকে আসুন, আমরা দুজন উঠে যাচ্ছি, চেপেচুপে হয়ে যাবে আপনাদের''।

আরতির মনে হয় কোথায় যেন দেখেছি ছেলেটিকে ? ভদ্রতা করে বলে, না না, ছি ছি, আপনাদের উঠিয়ে দিয়ে .....

''আরে না না, আমরা নয় পালা করে ওঠাবসা করে নেব। কোনো অসুবিধা নেই; আপনারা চলে আসুন এদিকটায়।'' আসে পাশে বসা দু'একজন একটু সরে জায়গা করে দেবার চেষ্টা করে। বর্ধমানে কিছুটা ফাঁকা হয় গাড়ি। বাকি পথটুকু সবাই মিলে দিব্যি গপ্পো করতে করতে কেটে গেল। ঝালমুড়ি, লেবুচা'ও খাওয়া হলো। দু'একজনের ঠিকানা আদান-প্রদান'ও হলো।

সকালবেলার ক্লাস শেষ হবার পর, দুপুরে খেতে যাবার আগে, মাঝখানের ওই সময়টাতে শ্রীসদনে একটা চিঠি বিলির কাজ ছিল। অমাবস্যা-সুধাদি চিঠি বিলি করতেন। মেয়েদের বাড়ি থেকে আসা চিঠি। খাম, পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ডলেটার, চোখের আতস কাঁচে ছেঁকে নিয়ে বিলি করতেন যার যার হাতে। পোস্টকার্ড, ছাড়া পেয়ে যেত সহজেই, ইনল্যান্ডলেটার হলে পিছনে লেখা ঠিকানাতে চোখ বুলিয়ে নিতেন একবার, আর খাম হলে, হাতে নিয়ে তার ওজন যাচাই করতেন। বিশেষত স্কুলের মেয়েদের ক্ষেত্রে। কলেজের মেয়েদের খামে চিঠি এলে একবার ঠান্ডা চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিতে ভুলতেন না। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে তো কম দিন হলো না !! চিঠি হাতে নিয়েই বুঝতেন সে চিঠির গন্ধ। হোস্টেলে দুজন সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন, দুজনেরই নাম সুধা। তবে একজন ফর্সা, সাদা চুল, লম্বা আর অন্য জন কালো, কালো চুল, বেঁটে। তাই তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল পূর্ণিমা সুধাদি আর অমাবস্যা সুধাদি। প্রথমজন নরম, অন্যজন গরম।

সাইকেল হাতে আরতি হোস্টেলে ঢুকতে ঢুকতেই শুনতে পেলো অমাবস্যা সুধাদির গলা, ''আরতি সেন, চিঠি আছে''। ভাবলে, কালকেই তো এসেছে বাবার চিঠি। যাইহোক, চিঠিটা নিতে গিয়ে দেখে খামে ভরা চিঠি, অচেনা হাতের লেখা। বাবা মা'র কাছ থেকে পোস্টকার্ড এ চিঠি পেতে অভ্যস্ত। কচিৎ কখনো ইনল্যান্ড লেটার। ঘরে গিয়ে বইখাতা টেবিলে রেখে, চিঠিটা নিয়ে বসলো খাটের উপর। ভিতরের কাগজ বার করে চোখের সামনে মেলে ধরেই দেখল লেখা Dear Arati !! চট করে পাতা উল্টে দেখে প্রেরকের নাম – Take care, Sandip অবাক হলো। ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে লেখা দেড় পাতার চিঠি; প্রেমের চিঠি নয়, কিন্তু আবেগ আছে চিঠিতে। এখানের আশ্রম, আশ্রমের ছেলেমেয়েরা দোল পূর্ণিমায় বসন্তের উৎসব, চাঁদের আলোয় বৈতালিক, আর সবশেষে ওই চার ঘন্টার বোলপুর – কলকাতা যাত্রাপথের আনন্দগান। দুএকটা ইংরেজি কোটেশন'ও ব্যবহার করেছে। পিছনের পাতার শেষে একদম নিচে P.S. দিয়ে প্রত্যুত্তরের আশা ব্যক্ত করেছে। দুই তিন বার পড়ে, আরতি চিঠিটা যত্নে ভাঁজ করে রেখে দিল ড্রয়ারে।

তিন-চার দিন দোলাচলে ছিল, তারপর উত্তরটা দিয়েই ফেললো।

জানালো চিঠি পেয়ে ভালো লেগেছে, তবে অবাক হয়েছে আরো বেশি। যে সব বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল তাদের খবরা-খবর লিখল। মজা করে লিখল, আমাদের আশ্রমে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি, ইতিহাস-ভূগোল, সংগীত ভবন কলাভবন, বাংলা, চীনা, জাপানি, ইংরেজি সব মিলেমিশে একটা বাগান তৈরি আছে। সেখানে আমরা সবাই রংবেরঙের প্রজাপতির মতন ঘুরে বেড়াই। আমাদের ক্লাস ঘরে দেয়াল নেই। গুরুদেব বিশ্বাস করতেন – ''বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহর/সেইখানে প্রেম .....''। চিঠি লিখে মনে হলো – বেশ হয়েছে লেখাটা। বিকেলে সমবায়ের দোকানে সাবান কিনতে যাবার পথে পোস্ট অফিসের ডাকবাক্সে ফেলে দিল চিঠি। তারপর থেকে উত্তরের অপেক্ষায় থাকে .....

এইভাবেই চিঠির পাখায় ভর করে গভীর হতে থাকে সম্পর্ক। সন্দীপ দুর্গাপুরে এলে অবশ্যই একবার ঘুরে যায় শান্তিনিকেতন। আরতির চিঠিতে ডুবে গিয়ে সে চিনতে শিখছে বাংলা মাটির সুবাস, আর আরতি তার কাছে ক্রমশ ধরা দিচ্ছে অধরা মাধুরীর ছন্দ বন্ধনে। এমনি করে বয়ে চলে সময়।

পঞ্চাশ বছর হলো আরতি পেরিয়ে এসেছে ছাত্রজীবন। মা-বাবার নিশ্চিন্ত গাছের ছায়াও আর নেই। আরতি-সন্দীপের সংসার এখন, দুই মেয়ে-জামাই আর তিন নাতি-নাতনি নিয়ে। সন্দীপ পড়াশোনা শেষ করে ফরেন সার্ভিসে

যোগ দিয়েছিল । তারপর থেকে আরতি শুধুই ঘুরে বেড়িয়েছে এ দেশ থেকে ওদেশ সন্দীপের পোস্টিং যখন যেমন হয়েছে । শান্তিনিকেতনের খুঁটি কিন্তু তার আলগা হয়নি কোনদিনই । পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, সামান্য সুযোগ পেলেই আরতি ছুটে এসেছে পূর্বপল্লীর আস্তানায় । সন্দীপ আসতে না পারলেও, সে একাই চলে এসেছে । মেয়েরা ছোট থাকতে তাদের ট্যাকে করে নিয়ে চলে আসতো । দিন সাত দশ থেকে, অন্যরকম পরিবেশে বেড়ে ওঠা মেয়েদের, চেষ্টা করত যতটা সম্ভব এই পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করাতে । তবে বাচ্চারা বড় হয়ে ওঠার পর আর তেমন শান্তিনিকেতনে আসতে চাইতো না তারা । তাদের পড়াশোনা সব বিদেশেই হয়েছে । সন্দীপ এসেছে কখনো-সখনো দুই তিন বছরে হয়তো একবার । সন্দীপ কাজ থেকে অবসর নেবার পর গত আট বছর তারা পুনে তে আস্তানা গড়ে ডানা গুটিয়ে বসেছে । আরতির ইচ্ছে ছিল জীবনের এই পর্বটা শান্তিনিকেতনে আবার শিকড়ের কাছে ফেরে, কিন্তু সন্দীপের ভাবনা অন্যরকম । এই বয়সে এসে হেলথ কেয়ার এর সুযোগ সুবিধাকেই গুরুত্ব দিতে হবে, তাছাড়া মাঝেসাঝে নানারকম কাজেকর্মে তাকে দিল্লী-মুম্বাই যাতায়াত করতেই হয়; শান্তিনিকেতন থেকে আসা যাওয়া করার অসুবিধা অনেক । পুনে সেদিক থেকে অনেক সুবিধাজনক । কিছুটা নিরিবিলি, আবার দরকার মতো সব পরিষেবাই হাতের নাগালে । আরতি মানিয়ে নেওয়ার মেয়ে, সংসারে সিদ্ধান্ত নেবার চেয়ে, সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই অভ্যস্ত সে । তার স্বামী সন্তানরা চিরকাল তাকে মাথায় করে রেখেছে যত্নে স্নেহে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় । কিন্তু সে চিরকাল ফুলফোটানো লতাগাছ । ফুল দেয় অজস্র, সৌরভ ছড়ায় নিঃস্বার্থ ভাবে । জায়গা জুড়ে দাঁড়ায় না, অথচ জড়িয়ে থাকে সকলকে ।

অনেক বলে কয়ে দুই মেয়ে দুই জামাই আর নাতি-নাতনিদের রাজি করিয়েছে আরতি এবার শান্তিনিকেতন আসতে । এক জামাই সাহেব, অন্য জামাই গোয়ান । এ তল্লাটের সঙ্গে কারোরই কোনো রকম পরিচয় নেই । পৃথিবীর এপার ওপার ছড়িয়ে থাকা সন্তান-সন্ততিদের একত্র করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা কি কম ঝক্কির কথা । তাও রাজি করানো গেছে কোনমতে । এক মাসের ছুটি নিয়ে আসছে তারা ইন্ডিয়াতে । নানান জায়গা ঘুরে শেষটা শান্তিনিকেতনে আট দশদিন সবাই জড়ো হবে ।

বনমালী বাগানে কাঁঠাল গাছের ডালে শক্ত করে দোলনাটা বাঁধছিল । দুলালিকে বলা আছে কাল থেকে ক'টা দিন এখানেই থাকবে । দোতলার দুটো ঘরে দুই মেয়ে জামাই, দেড়তলার ঘরে সন্দীপ আর নাতিবাবু, আর নীচ তলায় আরতির বড়ো পালঙ্কটা তে আরতি আর দুই নাতনি । ব্যবস্থা সব পাকা করে, নতুন কেনা চাদর বালিশের ওয়াড় আলমারি খুলে বার করে দিচ্ছিল আরতি ।

দুলালী কে বললো, ভাল করে দেখে টিকটিকি আরশোলা সব বার করে দিবি ঘর থেকে । আমার নাতনিরা বড্ড ভয় পায় । শান্তিনিকেতন তো টিকটিকির আড়ত । মুড়িওয়ালীকে বলা আছে, পরশুদিন সকালে এখানে এসে মুড়ি ভাজবে । পিছনের উঠোনে মাটির উনুন'টা তে কাঠ দিয়ে রাখিস । মনে মনে ভাবে — মুনিয়াদিদি আমার Puffed rice with mustard oil খেতে ভালোবাসে । গরম বালির ওপর চাল ফেললেই কেমন জুঁই ফুলের মতন মুড়ি ফুটে ওঠে, সে সব তো দেখেনি ওরা, দেখে খুব মজা পাবে । শেষ মুহূর্তের নির্দেশগুলি ঝালিয়ে নেয় — ফলগুলো সব বাইরেই থাক, কাঁচা সবজি আর মাছ মাংস ফ্রিজের মধ্যে তুলে দিবি ।

তিলের তক্তি, নারকেল নাড়ু, এলোঝেলো, কাটা নিমকি, প্যারাকী — এইসব দিশি মুখরোচক একটু একটু করে গত একমাস ধরে ঘরেই তৈরি করে রেখেছে ওদের জন্য ।

একবার ভাবলো জামাইদের জন্য বিয়ার আনিয়ে রাখবে নাকি ? তারপর মনে হলো থাক, কাল সন্দীপ তো ওদের সঙ্গেই আসবে । ওই ডিপার্টমেন্ট-টা ওই সামলাক । তারচেয়ে বরং আট-দশটা ডাব পাড়িয়ে রাখাই ভালো হবে ।

খুব আশা করেছিলো পৌষমেলা থাকতে থাকতেই নাতি-নাতনি, মেয়েরা সবাই এসে পড়বে কিন্তু তা হলো না । উবু হয়ে মাঠে বসে সাঁওতালি গয়না কেনার মজাটাই হলো না । সেঁজুতির আড্ডায় নাচ-গান জমে উঠলো যখন, তখন ওদের জন্য খুব মন কেমন করেছিল । কিন্তু আরতির ইচ্ছায় কোন সিদ্ধান্তই আজকাল আর হয় না । ওরা সব বড় হয়ে গেছে ।

সন্দীপও জোর দিয়ে কিছু বলে না ওদের। অন্তত সে'ও তো কটা দিন আগে এলে পারত ? আরতির ব্যাচে যারা এম এ পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের রিউনিয়ন এ বছর পৌষ মেলার সময়। একবছর আগে থেকে প্রস্তুতিপর্ব চলেছে। সেই সুবাদে বেশীরভাগ প্রাক্তনীরাই এসেছে এবার। ছোটবেলাকার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দ, তারপরও আরো দুটো প্রজন্মের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, এই সবটা নিয়ে মনের মধ্যে মহা এক পরিতৃপ্তির আমেজ তৈরি করেছিল সে। কিন্তু ঠিক তেমনটি হলো না। বিদেশে Christmas উপভোগ করা নাতি নাতনি, জামাইদের দেখানো হলো না শান্তিনিকেতনে খৃষ্টোৎসবে কাঁচঘর মন্দির কেমন সেজে ওঠে মোমবাতির আলোয়, আর অর্গানে বেজে ওঠে Christmas Carol, সঙ্গে গুরুদেবের গান আর প্রার্থনা মন্ত্র। কি এমন ক্ষতি হতো দুটো দিন আগে এলে ? অভিমান হয়। পরক্ষণেই মন থেকে তা ঝেড়ে ফেলে, ওদের আসার অপেক্ষায় থাকে। কাল দুপুরের ফ্লাইটে কলকাতায় নামবে ওরা, এয়ারপোর্ট থেকেই গাড়ী নিয়ে সোজা শান্তিনিকেতন। বাড়ি আসতে আসতে সন্ধ্যে – রাত হয়ে যাবে।

আরতিদের বাড়ি থেকে নন্দিনীদের বাড়ি হাঁটাপথে দুমিনিট। আজ বিকেলে সেখানে চায়ের আড্ডায় বসবে পুরনো বন্ধুরা। রাতের খাওয়াও সেখানেই। হাউসকোটটা ছেড়ে একটা সুন্দর শাড়ি পরলো, চুলটা হাত খোঁপা করে বেঁধে দুটো দোলনচাঁপা তুলে লাগালো ঘাড়ের কাছে। ঘরটা গন্ধে ম ম করে উঠলো। কোথায় লাগে ফ্রেঞ্চ পারফিউম ! গুঁড়ো টিপ পরেছে আজ কতদিন পর। কলেজে থাকতে হস্টেলে এসব নিজেরাই তৈরি করতো মনে পড়ে। পোস্টকার্ড পুড়িয়ে হলুদ আর মেটে সিঁদুর মিশিয়ে কি সুন্দর রং হতো। মোবাইল-টা হাতে নিয়ে পা বাড়াল বন্ধুদের আড্ডায়।

চা আর গরম গরম নানা ধরনের ফুলুরিতে আড্ডা জমে উঠেছে। ষাট পার করে সত্তর ছুঁই ছুঁই তরুণীরা আজ ফিরে গেছে ছোটবেলার সেই সোনাঝুরি দিনে। যে তরুণী একদিন দাপিয়ে নাচতো আশ্রমের যে কোনো অনুষ্ঠানে, তার হাঁটুতে এখন বাত, ... কিন্তু তাতে কি ? মনে তো সে আজও তরুণী। চেয়ারে বসে বসেই সে হাতের মুদ্রায় নাচছে, সবাই মিলে গাইছে ''কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা/তারই মধ্যে চিরজীবন বইবো গানের ডানা।'' উঠে আসছে মেয়েবেলার কত মজার দিন, চৈত্রের শেষে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া কালবৈশাখী ঝড়ে আম কুড়াতে যাবার আনন্দ, গোয়ালপাড়ার পিকনিক, মুক্তি যুদ্ধের সময় ঢাকা থেকে আসা মেয়েদের, আবাসিকেরা কেমন আপন করে নিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে শেখা মুক্তি যুদ্ধের কত গান তখন শেখা হয়েছিল, নাট্যঘরে বর্ষা মঙ্গল, বৃক্ষরোপণের দিন দোলায় করে আসা শিশু বৃক্ষের চারা রোপণ . . . . . তারই সঙ্গে সঙ্গে চলছিল উত্তর শান্তিনিকেতন পর্বের কথাও। ছেলে, মেয়ে, জামাই, পুত্রবধূ, শাশুড়ি, সংসার কিছুই বাদ নেই; তবে তারই মধ্যে নাতি নাতনীদের কথা উঠলে আর দেখতে হবে না। সাতখানা করে তাদের ব্যাখ্যা। তারা সবাই সমুদ্র মন্থন করে তুলে আনা এক একটি রত্ন বিশেষ। নাতি নাতনিদের কথায় কোনো দিদাই আর বিরাম মানেন না। এই রকম নানাবিধ আড্ডা চলতে চলতে হঠাৎ করে ঠিক করা হলো – আগামী কাল চল কোপাই-এর পাড়ে পিকনিক করা যাক, সুকন্যার হোম স্টে থেকে খাবার অর্ডার করে দেওয়া যাবে, সকালে গিয়ে বিকেলে ফেরা। সবাই এক বাক্যে রাজি, শুধু আরতির যাওয়া হবে না – কাল যে তার ঘর ভরা ফসল উঠবে গত এক মাস ধরে তারই প্রস্তুতিতে ছিল সে। প্রাক্তনীরা নাছোড়বান্দা। বলে, বিকেলের মধ্যেই তো ফিরবো, তোর ছেলেপিলেরা আসতে আসতে সন্ধ্যে। কোনো কথা শুনবো না, চল তো ? আরতি বলে, ''না রে, কাল নিজের হাতেই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নিয়েছি, কতদিন পরে সব একজোট হবে। কালকের রান্না দুলালীর হাতে ছাড়া যাবে না।'' এরপর জোরাজুরি চলতে থাকে। আরতির তাদের সঙ্গে যাবার ইচ্ছে বারোয়ানা কিন্তু ষোলোআনা আহ্লাদ পুরো পরিবারের সঙ্গে বহুদিন পর একত্রে দেখা হবে, তাই।

এই জোরাজুরি টানাটানির মধ্যে চোখ পড়ে মোবাইল ফোনে, আলো জ্বলছে, অর্থাৎ Call আসছে। গান চলছিল বলে সাইলেন্ট করা ছিল ফোনটা। এখন দেখে তিনটে Missed call দুই মেয়ের নাম্বার। হ্যালো, হ্যালো ? কথা শোনা যায় না। নন্দিতা বলে, ''ঘরের ভেতর টাওয়ার ধরে না, তুই বাগানে গিয়ে Call কর। আরতি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাগানে যেতে যেতে ফোন লাগায়। কি রে ? ফোন করছিলি ? আর বলিস না, আমাদের আড্ডা আজ যা জমেছে, গান, কবিতা হচ্ছিল বলে ফোন সাইলেন্ট করে রেখেছিলাম। সব গোছগাছ করে নিয়েছিস তো ? এখানে কিন্তু ভালোরকম ঠান্ডা,

কলকাতার ঠান্ডা দেখে বিচার করিস না । গাড়িতে আসার সময় বাচ্চাদের দু একটা গরম কাপড় বাইরে রাখিস বেশি করে, তোদের পৌঁছতে রাত হবে তো ।

এক নিঃশ্বাসে বলে যান উৎসাহের জোয়ারে ।

ওপার থেকে মধুরা বলে, ''মা, শোনো না, আমরা গতকাল যে জায়গাটায় এসেছি, দেরাদুন থেকে ঘন্টা তিনেক, ''কানাতাল'', পাহাড়ের উপরে, কি যে অপূর্ব তুমি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না । তেমনি সুন্দর হোটেলটা, পাহাড়ের ঢালুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাংলোগুলি, আর কি ফুল, কি ফুল ! এই রিসর্টের যে শেফ, সে তো একেবারে ফাইন ডাইনিং এর শেষ কথা, কি যে exotic সব খাবার খাওয়াচ্ছে ভাবতে পারবে না । তোমার জামাই আর নাতি নাতনিদের তো এখান থেকে নড়ানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে ।''

আরতি খুশি হয়ে বলে, ''বাঃ খুব ভালো, সবাই আনন্দ করছিস জেনে কি যে ভালো লাগছে, পরের বার যখন দেশে আসবি তখন আমিও যাবো, এবারে হলো না আমার । আচ্ছা শোন, কাল খুব ভোর ভোর বেরিয়ে পড়িস কিন্তু, দেরাদুন-দিল্লি-কলকাতা : ফ্লাইট ধরার আগে হাতে সময় থাকে যেন । বাচ্চাগুলোর একটু স্ট্রেইন হবে । সব হল্ট গুলোতে পৌঁছে আমায় ফোন করবি, আমি চিন্তায় থাকবো ।''

এবার ছোট মেয়ে অন্তারা ফোনে আসে,

— মা, শোনো — there's a change in programme আমরা এক সপ্তাহ এক্সটেন্ড করছি এখানের স্টে । তাই শান্তিনিকেতন-টা এবার ক্যানসেল করছি, পরের বছর যাবো ঠিক । মুনিয়ার অল্প নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়েছিল একদিন, তাই আবার চান্স না নেয়াই ভালো । মেলার পর শান্তিনিকেতনে বড্ড ধুলো, এখানে একদম পলিউশন ফ্রি । একদিকে বরফে ঢাকা হিমালয়ের গারোয়াল রেঞ্জ, অন্য দিকে সবুজ ঢাল নেমে গেছে মুসৌরি দেরাদুন । আমরা আছি ঠিক মাঝখানে । অপূর্ব অপূর্ব !!!

বাবা কে বহু কষ্টে রাজি করানো গেছে on a condition যে তোমাকেও আমরা আনিয়ে নেবো এখানে । বাবা তোমাকে খুব মিস করছে — বাবা !! কি প্রেম এখনও !! He just can't do without you !! we all miss you মা । হ্যালো, হ্যালো ? মা are you there ?

— হ্যাঁ, শুনছি

— আচ্ছা ভালো করে শোনো, আমরা সব ব্যবস্থা করে নিয়েছি; কাল সকাল ১০টা ১১টার মধ্যে গাড়ি পৌঁছে যাবে তোমার কাছে, তুমি সন্ধ্যের মধ্যে কলকাতা পৌঁছে যেও । রাজারহাটে মনিমাসিকে বলা আছে, রাত্রে ওখানে থেকে, তুমি সকালে দিল্লির ফ্লাইট নেবে, দিল্লিতে নেমে এক ঘন্টার মধ্যেই দেরাদুনের ফ্লাইট ছাড়বে, ৪৫ মিনিটের ফ্লাইট । Airport এর বাইরে গাড়ি থাকবে । ব্যস, তুমি সোজা চলে আসবে আমাদের কাছে । মনিমাসির কাছে তোমার সব ফ্লাইটের টিকিট আর দেরাদুনের গাড়ির নম্বর পেয়ে যাবে তুমি । ঠিক আছে ? চলে এসো তবে । উফ্, Can't wait to be with you ফোনটা কেটে দেবার পর স্তব্ধ হয়ে থাকে আরতি । অভিমানে বুকের মধ্যে জলপ্রপাতের শব্দ । মধুরা আর অন্তরার কথাগুলো মাথার মধ্যে, কানের মধ্যে ঝনঝনিয়ে বাজছে । কি করবে সে ? তার ইচ্ছে তার মতামত কোনো কিছুর মূল্য .... তার এক মাস ধরে গুছিয়ে তোলা, সাজিয়ে রাখা ঘরদুয়োর .... এক মুহূর্তে .... আর ভাবতে পারছে না ।

থমথমে মুখে ঘরে এসে ঢোকে, কিন্তু চোখের সামনে সব অন্ধকার । মিতালী অদিতি সুচিস্মিতা সবাই প্রায় সমস্বরে বলে, ''কি রে ! কি হলো ! তোর শরীর খারাপ লাগছে ? বোস, জল খাবি ? কি বললো ফোনে ? সব ঠিক আছে তো ? আরতি চুপ করে বসে থাকে খানিক, তারপর নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলে ..... ''না রে, সবাই ঠিক আছে । আমি যাবো তোদের সঙ্গে কাল কোপাই-এর পাড়ে । ওরা কেউ আসছে না ।'' তার গলার স্বর স্বাভাবিক ঋজু, কিন্তু চোখ দিয়ে বইছে

ধারা। আনন্দমেলা মুহূর্তে বিষাদের রূপ নিলো। একটা অবসন্ন মেঘের মধ্যে থেকে আরতি দু একটা গলার শব্দ শুনছে শুধু, ছেঁড়া ছেঁড়া ভাঙা ভাঙা কিছু আওয়াজ।

— আমি আজ উঠি রে, কাল আমায় তুলে নিস যাবার আগে। ঘর ভরা অনেক মাছ মাংস, সুকন্যার কাছে নামিয়ে দিয়ে গেলেই হবে।

বান্ধবীরা আর কিছু বলে উঠতে পারে না। আরতি পা বাড়ায় গেটের দিকে, সেই সঙ্গে ওরাও বাগান পেরিয়ে এগিয়ে আসে কিছুটা। আরতি একটা ঘোরের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পথ ধরে। অভিমান, ভীষণ অভিমান, — কার কাছে গেলে জুড়াবে এই কষ্ট ? বাড়ি ফিরে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দোর দেয়। বনমালী, দুলালীরা শুয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই। আরতি বালিশে মাথা রেখে স্থির দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সিলিংয়ের দিকে। ঘড়ির কাঁটা মধ্যে রাত পেরিয়ে যায়, ঘুম নেই, বুক ফাটা অভিমানে নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে বিছানায়। একসময় আকাশ সাদা হয়, সূর্যোদয়ের আগে ব্রহ্ম মুহূর্ত। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বসে বাগানে বেতের চেয়ারে। অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোর হচ্ছে, কি প্রশান্তি চারিদিকে —।

''তোমার আলো ভালোবেসে —
পড়েছে মোর গায়ে এসে''

সেই বিরাট মানুষটি যিনি দু বাহু বাড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছেন এই আশ্রম, তাঁরই কাছে মনের সব আরাম। মনে মধ্যে ফুটে ওঠে মন্ত্রের মতো কয়টি পংক্তি:

''শুধু অকারণ পুলকে
নদী জলে পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে
ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন ঝলমল প্রাণ করিস যাপন
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলকে
মর্মরতানে ভরে ওঠ গানে শুধু অকারণ পুলকে ।।''

বনমালী ভোরে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে দিদিমণি বাগানে বসে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে ''আজ এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন ? চা নিয়ে আসি আপনার।''

আরতি শান্ত গলায় বলেন — ''বনমালী, আমার বড়ো বাক্সটা নামিয়ে দে তো, ১০ টায় গাড়ি আসবে, আমি কলকাতা ফিরবো। ঘরদোর এমনই সুন্দর করে গুছিয়ে রাখবি, আমি আবার আসবো শিগগির-ই। খাবারদাবার গুলো নন্দিনীদির বাড়ি পৌঁছে দিস। তোদের জন্য রাখিস যা লাগে।''

বনমালী কিছু বুঝে ওঠার আগেই আরতি নিজের ঘরে চলে যান। গোছগাছে মন দেন।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

খেলা যখন

সোফার নরম গদিতে শরীরটা এলিয়ে পাশে বসা গিন্নিকে দেখছিল ব্রহ্মানন্দ। মুখে গাম্ভীর্য এঁটে বসে আছে অলকা। তামাটে মুখে গুটিবসন্তের অগুনতি দাগ। দুপুরে টুথব্রাশে রং লাগিয়ে কলপ করেছিল নিজে হাতে। তাতেই কান্ডটা হয়েছে। চওড়া হয়ে যাওয়া সিঁথিতে ধ্যাবড়া হয়ে লেগে আছে কলপের কালি। চশমাটা নেমে এসেছিল নাকের ডগায়। সেটাকে তর্জনী দিয়ে ঠেলে যথাস্থানে তুলে দিল অলকা। মুখ কুঁচকে তাকাল সিলিংফ্যানটার দিকে।

মেয়ের মা কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, দিদি, গরমে খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না?

অলকা মুখে লেগে থাকা বিরক্তিটা মুছতে মুছতেও খানিকটা রেখে দিল। মেকি হাসি হেসে বলল, না ঠিক আছে।

প্রকৃতির রোষানলের দায় যেন তাঁদের ওপরই বর্তায় এমন একটা মুখ করে মেয়ের বাবা বলে উঠলেন, অক্টোবর যেতে চলল অথচ দেখুন গরমটা যাবার নাম করছে না। ডুয়ার্স আগে এমন ছিল না। এখন গাছ-টাছ কেটে ..।

অনভ্যস্ত শাড়িতে জড়োসড়ো পাত্রী ট্রে-তে করে মিস্টি নিয়ে ঢুকেছিল ঘরে। এখন বসে আছে উল্টোদিকের চেয়ারে। গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের থেকে লম্বা। পানপাতার মতো মুখ। বেশ একটা লক্ষ্মীমন্ত ভাব আছে।

মেয়ে দেখতে এলে মেয়ের ঘরদোরও তীক্ষ্ম চোখে দেখার নিয়ম। তো, সেটাই করছিল ব্রহ্মানন্দ। মেয়ের বাবার কথার সুতো ধরে বলল, ডুয়ার্সে এমন ঠা ঠা গরম ওদিকে স্টকহোমে এখন কনকনে ওয়েদার। কাল রাতেই জয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ওখানে টেম্পারেচার নয়-দশ চলছে বলল। তারপর কুইজ মাস্টারের ঢঙে মেয়েটিকে বলল, স্টকহোম কোথায় জান ?

পাত্রী চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিয়ে বলল, হুঁ সুইডেনের রাজধানী।

কিছু টুকিটাকি তথ্য মুখস্থ করে রেখেছে ব্রহ্মানন্দ। সুযোগ পেলেই বলে থাকে। কলপ করা গোঁফের ফাঁক দিয়ে হেসে ব্রহ্মানন্দ বলল, কলকাতা থেকে মুম্বই হয়ে মিউনিখ হয়ে সুইডেন যেতে হয়। আর একটা রুট আছে, সেটা অবশ্য দোহা হয়ে।

মেয়ের বাবা জুট কনসালট্যান্ট। রোজগার মনে হয় ভালই। এই বাড়ির ড্রয়িংরুমে ঢুকে ব্রহ্মানন্দের চোখ প্রথমেই গিয়েছিল সোফার রংবাহারি কুশন কভারগুলোর দিকে। তাতে সুতো দিয়ে বোনা নকশা। ড্রয়িংরুমে অজস্র জিনিস। কাঠের শেলফ, সোফা, ল্যাম্পশেড, বাহারি টব, বই, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি।

এই আলিশান বৈঠকখানার পাশে অলকার হাড় জিরজিরে বাপের বাড়ির ছবিটা মিলিয়ে দেখছিল ব্রহ্মানন্দ। তখন এক মারোয়াড়ির গদিতে খাতা লেখে সে। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। বয়স চল্লিশের ঘর ছুঁতে চলেছে। বাড়ি থেকে বিধবা মা বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল প্রতিনিয়ত। এক বর্ষার বিকেলে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে অলকাকে দেখতে গিয়েছিল সে। দূর সম্পর্কের এক খুড়িমা এনেছিল সম্বন্ধটা।

অলকার বাবা বিডিও অফিসের পিয়োন। সাপটিবাড়িতে বাড়ি। বাড়ি বলতে বেড়ার ঘর, ওপরে টিন। মেঝেতে ইট বসিয়ে সিমেন্ট দিয়ে পাকা করার চেষ্টা করা হয়েছিল কখনও। কিন্তু ভিত গাঁথা না হওয়ায় মেঝে বসে গিয়ে ফুটিফাটা অবস্থা। একধারে মাচানের ওপর বীজ ধান আর খোলের বস্তা সাজানো। অলকার কাকা বিয়ে থা করেনি। পালা লেখে।

সে থাকে ঘরের এদিকটায়। অন্য ধারে অলকারা। সেখানে দুখানা পাশাপাশি চৌকি, তাতেই তিনজনের শোয়া বসা।

জীবনে প্রথম মেয়ে দেখা বলে ব্রহ্মানন্দ ভেতরে ভেতরে একটু ঘাবড়ে ছিল। তার বন্ধুটিই যা প্রশ্ন করার করল। মেয়ে সেলাইফোঁড়াই, রান্না, গান জানে কি না এসব মামুলি প্রশ্ন। ব্রহ্মানন্দ তেমন রা কাড়ল না। আসলে অলকাকে দেখে তার মনে ধরেনি। ধরার কথাও নয়। অলকার গুটিবসন্ত হয়েছিল ছোটবেলায়। সেই দাগ পাকাপোক্ত চিহ্ন রেখে গেছে সারা মুখ জুড়ে। দাঁতের সেটিংয়েও সমস্যা আছে। সামনের দাঁতগুলো উঁচু। তবে অলকা মাধ্যমিক পাশ। কিন্তু ডিগ্রি ধুয়ে কি ব্রহ্মানন্দ জল খাবে ? 'পরে সিদ্ধান্ত জানাব' বলে ফিরে এসেছিল সে আর তার বন্ধু।

মেয়ে দেখে আসার কিছুদিনের মাথায় ঘটল ঘটনাটা। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাঁয়ের কাদামাখা পথ ধরে বাড়ি ফিরছিল অলকার বাবা। কথা নেই বার্তা নেই মাথার ওপর বাজ পড়েছিল। ট্যাঁ ফোঁ করার সময় দেয়নি, সঙ্গে সঙ্গে শেষ। নীল হয়ে গিয়েছিল বডি। বাজের আঘাতে একটা মোষও চোখ উল্টে মরে পড়েছিল পথের ধারে। অল্পদিনের মধ্যেই বাবার চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল অলকা। সকলের পরামর্শ শুনে মত বদলেছিল ব্রহ্মানন্দ। রাজি হয়ে গিয়েছিল বিয়েতে।

অলকা চাকরিতে ঢুকেছিল পিয়োন পদে। দু'বছরের মধ্যে প্রোমোশন পেয়ে কেরানি হয়ে গেল। ততদিনে ব্রহ্মানন্দ মারোয়াড়ি গদিতে খাতা লেখা ছেড়ে জীবনবিমার ক্যারিয়ার এজেন্ট হয়ে গেছে। আর্থিক স্বচ্ছলতাও এসেছে সেই সঙ্গে।

ছোট থেকেই পড়াশোনায় ভাল ছিল জয়। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ভাল ফল করে ভর্তি হয়েছিল সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। ক্যাম্পাসিংয়ে চাকরি পেয়ে গিয়েছিল একটা নাম করা কোম্পানিতে। চেন্নাইতে পোস্টিং। তিন বছরের মাথায় ছেলে প্রোমোশন পেয়ে পাড়ি দিয়েছে বিদেশে।

বহুজাতিক সংস্থাতে চাকরি করা ছেলে। হাই ভোল্টেজ পেডিগ্রি না থাক বিয়ের বাজারে তার দাম কম নয়। ব্রহ্মানন্দকে ঠেলে গুঁতিয়ে খবরের কাগজের "পাত্রী চাই" কলামে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল অলকা। যা হয়, বিস্তর সম্বন্ধ এসেছে। এর আগে পাঁচখানা মেয়ে দেখে এসেছে দু'জনে। এটা ছ'নম্বর।

পাত্রীর বাবা-মায়ের অনুরোধ ফেলতে না পেরে ব্রহ্মানন্দ একটা সন্দেশ তুলে নিল। অলকা মিষ্টি ছুঁয়ে দেখল না। চায়ে দু তিনটে চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত জড়ো করে বলল, আজ আসি। যথাসময়ে ফোন করব।

রিক্সায় চেপে ফিরছিল ব্রহ্মানন্দ আর অলকা। একটা পানের দোকানে রিক্সা দাঁড় করিয়ে ব্রহ্মানন্দ ডিলাক্স জর্দা দিয়ে দুটো সাজা পান নিল। অলকার হাতে একটা পান ধরিয়ে নিজে একটা মুখে পুরল। অলকা ভুরু তুলল, কী বুঝলে ?

ব্রহ্মানন্দ মুখ ভেটকে বলল, জয়ের হাইট মেরেকেটে সাড়ে পাঁচ। এই মেয়ে তালঢ্যাঙা। জয়ের পাশে মানাবে না।

অলকা সায় দিয়ে বলল, আমিও সেটাই ভাবছিলাম। তাছাড়া আমরা বরিশাইল্যা বাঙাল। এরা সুতানটির ঘটি। এদের সঙ্গে আমাদের মিশ খাবে না।

ব্রহ্মানন্দ গলায় আগ্রহ মিশিয়ে বলল, একটা নতুন খবর এসেছে। মেয়ের বাবা ইনকাম ট্যাক্সের ইন্সপেক্টর। মা হাইস্কুল টিচার। নিজেদের দোতলা বাড়ি। একমাত্র মেয়ে। ডিসট্যান্সে এমএ করছে।

অলকা বলল, বেশ তো যাওয়া যাবে একদিন। তারপর পিচিক করে রাস্তায় পানের পিক ফেলে বলল, তুমি তো পেট পাতলা। এই যে আমরা মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছি এটা জয়কে ভুলেও বলে বোসো না।

ব্রহ্মানন্দ চাপা গলায় বলল, পাগল না কি ! জয়ের এমনিতে ঠান্ডা স্বভাব কিন্তু রেগে গেলে চন্ডাল। ঝাড়াই বাছাই করে কাজটা এগিয়ে রাখার জন্যই যে ওর জন্য মেয়ে দেখছি সেটা বুঝতে চাইবে না।

ব্রহ্মানন্দর পুরনো কথা মনে পড়ছিল। মারোয়াড়ি গদিতে তখন কীই বা মাইনে। একা লোকেরই চলে না সেই টাকায়। সাপের ব্যাং গেলার মতো অলকাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল সে। কৃতী ছেলের বাপ হয়ে অ্যাদ্দিনে মনের সাধ মিটিয়ে নেবার সুযোগ জুটেছে। সেটা মেটাচ্ছেও সে। মেয়ে দেখে চলেছে একের পর এক। বড়লোক বাড়ির মেয়ে। গরিব বাড়ির মেয়ে। বেঁটে মেয়ে। ঢ্যাঙা মেয়ে। ফর্সা মেয়ে। কালো মেয়ে। রোগা মেয়ে। মোটা মেয়ে।

আড়চোখে অলকাকে দেখল ব্রহ্মানন্দ। ঘচর ঘচর করে পান চিবোচ্ছে। অলকা একবার কথায় কথায় বলেছিল ব্রহ্মানন্দর আগে তাকে জনা আষ্টেক পাত্র দেখে গিয়েছিল। দুরুদুরু বুকে তাকে সেজেগুজে বসতে হয়েছিল তাদের সামনে। কিন্তু চলে যাবার পর কেউ আর খবর দেয়নি। একে গরিব ঘরের মেয়ে তার মধ্যে কুৎসিত। কে করবে তাকে বিয়ে! সেই জ্বালা এখনও জুড়োয়নি। সব অপমান আজও বুকের মধ্যে পুষে রেখেছে অলকা। মুখের লালায় রসস্থ হয়ে যাওয়া পানের ছিবড়েগুলোকে জোরে জোরে দাঁত দিয়ে পিষছে অলকা। কেন পিষছে সেটা কি আন্দাজ করতে পারে না ব্রহ্মানন্দ? বিলক্ষণ পারে।

এবার পাত্রীর খুঁত খুঁজে বের করেছে ব্রহ্মানন্দ। পরের বার অলকার পালা। ব্রহ্মানন্দ জানে, ঠিক কোনও না কোনও কারণ দেখিয়ে ব্যাগড়া দেবে অলকা। আবার তার পরের পাত্রীকে ঠিক কোনও ছুতোয় বাতিল করবে ব্রহ্মানন্দ। এই খেলা চলতেই থাকবে যতদিন জয় টের না পায়।

দু'জনেরই মনের অতলে গোপন একটা ক্ষত আছে। কোনও অ্যান্টিসেপটিকেই সেই ক্ষত নিরাময় হবে না কখনও। সেটা বুঝেই এই খেলাটা খেলছে দু'জনে। খেলছে চুপিচুপি। নিজের মনকেও চোখ ঠেরে খেলছে। কোনওদিনই কেউ কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলবে না। কিচ্ছুটি না।

কৌশিক মজুমদার

পোস্টকার্ড

। ১ ।

ঝাঁ চকচকে হাউসিং-এর এই ফ্ল্যাটে ভাড়া আসার এক সপ্তাহের মধ্যে ধৃতি বুঝল এখানে না আসলেই হত। একে তো ভাড়া বেজায় বেশি, কতদিন দিতে পারবে জানে না, আর তার চেয়েও বেশি মুশকিল হাউসিং-এ সে ছাড়া সবাই বেশ হোমরাচোমরা লোক। কেউ কাউকে পাত্তা দেয় না। কথা বলা, আলাপ করা দূরে থাক। টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ার একেবারে কাছে এত সুন্দর ফ্ল্যাট ভাড়া পেয়ে সহজে ছাড়তে চায় নি। এমনিতেই এই তাঁর প্রথম কলকাতায় থাকা, তাও একা। মা কিছুদিন এসে ছিলেন, কিন্তু তিনিও আর কতদিন থাকবেন। মূলতঃ দুটো কারণে এই ফ্ল্যাট পছন্দ হয়ে গেছিল ধৃতির। তাঁর ব্যালকনি থেকে কলকাতার স্কাইলাইনের অনেকটা দেখা যায়। এই নিঃসঙ্গ জীবনে ওটুকুই তাঁর অক্সিজেন। দ্বিতীয়, ফ্ল্যাটের একটা ঘরে ঠাসা মেঝে থেকে দেওয়াল অবধি নানা দেশি বিদেশি বই। এ জিনিস সবার ভাগ্যে জোটে না।

ধৃতির আগে এখানে থাকতেন বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার সুপ্রিয় বসু। অকৃতদার। কোন ওয়ারিস নেই। তিনি মারা যাবার পর এই ফ্ল্যাট তালাবন্ধ ছিল। দালাল প্রথমে আমতা আমতা করছিল বটে, "আসলে একটা ঘর কিন্তু পুরো বইতে ভরা, ওটা ইউজ করতে পারবেন না" আর সেটা শুনেই ধৃতি লাফিয়ে উঠে এই ফ্ল্যাটটাই নিল।

ধৃতি সবে জার্নালিজম পাশ করে বীরভূম থেকে পাকাপাকি কলকাতায় এসে আছে। এখন একটা সংবাদ চ্যানেলে ফ্রিলান্সে কাজ করে। বড়লোকের মেয়ে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে চাকরিটা নিয়েছে। দুপুর নাগাদ অফিসে যায়, গভীর রাতে অফিসের গাড়ি এসে ফ্ল্যাটের সামনে ছেড়ে দিয়ে যায়। এখন বাজারে একটাই খবর। সুপ্রিয় বসুর লেখা শেষ স্ক্রিপ্ট "বিষণ্ন সকাল" থেকে তৈরি সিনেমা দুই সপ্তাহ আগে রিলিজ করেছে। আর রিলিজ হতেই সুপারহিট। এতবড় ওপেনিং সুপ্রিয় বসুর আগের কোন ছবি পায় নি। কারণটাও ধৃতি আন্দাজ করতে পারে। সুপ্রিয় বসুর মৃত্যু। সুপ্রিয় বসুর মৃত্যুকে ঠিক স্বাভাবিক মৃত্যু বলা যায় না।

। ২ ।

এক মাস আগে যখন সুপ্রিয় বসুর মৃত্যু হল তখন কাগজে কাগজে হেডলাইন হয়েছিল এই নিয়ে। সুপ্রিয় বসুর বয়স হয়েছিল, খিটখিটে হয়ে পড়ছিলেন। শেষের দিকে বর্তমান সরকারের একেবারে পিছনে পড়ে গেছিলেন। পত্রিকা হোক বা টিভি সাক্ষাৎকার, সুযোগ পেলেই সরকারের তুলোধোনা করতে ছাড়তেন না। তাই তাঁর মৃত্যুর তেমন কোন তদন্তও হয় নি। এমনিতে দেখতে গেলে মৃত্যুতে রহস্যের কিছু নেই। ছয়মাসে একদিন লাইব্রেরী গোছাতেন সুপ্রিয়। সেদিনও তেমনই একদিন ছিল। সকাল থেকে ঘরাঞ্চির মাথায় উঠে তাকের বই সাজাচ্ছিলেন। বাড়ির কাজের মহিলা দেখেছে। এমনকি দারোয়ান একবার কি কাজে এসেছিল, সেও তাঁকে ঘরাঞ্চির মাথায় দেখেছিল। সে নাকি সুপ্রিয় বাবুকে সাহায্যের অফারও করে। সুপ্রিয় রাজি হন নি। শুধু বলেন বেরিয়ে যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যেতে। দারোয়ান সেটাই করেছিল। ইয়েল লক। ভিতর থেকে না খুলে দিলে কারও ঢোকা সম্ভব না। পরদিন কাজের মহিলা এসে দেখে দরজা বন্ধ। কলিং বেল বাজিয়েও কোন কাজ হয়নি। সে দারোয়ানকে জানায়। দারোয়ান পুলিশকে। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঢুকে দেখে ঘরাঞ্চি একদিকে কাত হয়ে পড়ে আছে আর পাশেই ঘাড় মটকে মরে পড়ে আছেন চিত্রনাট্যকার সুপ্রিয় বসু। তাঁর জীবনের চিত্রনাট্য যে এত করুণ ভাবে শেষ হবে তা কেউ বোঝেনি। প্রাথমিক তদন্তের পর গোটা ঘটনাকে

অ্যাক্সিডেন্ট তকমা দিয়ে কেস ক্লোজ করে দেওয়া হয়। ধৃতির জার্নালিজমের কোর্স সবে শেষ হয়েছে তখন। নিয়মিত খবর রাখত সে কোন অন্যরকম ক্লু বেরোয় কি না। কিন্তু সে গুড়ে বালি। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল দুর্ঘটনা। পুলিশ বারবার সিসি টিভি ফুটেজ দেখেছে। কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখা যায় নি। ঘরের জানলা, ব্যালকনির দিকে দরজা সব ভিতর থেকে বন্ধ। ফাউল প্লের কোন অবকাশই নেই।

সেদিন শুক্রবার। ধৃতির ছুটি ছিল। একটু দেরি করেই দশটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠেছে। ব্রেকফাস্ট বানিয়ে ল্যাপটপে নেটফ্লিক্স ওয়েব সিরিজ ছেড়ে বসল ধৃতি। কাউকে না বললেও ওঁর মনে মনে একটা গোপন ইচ্ছে আছে। স্ক্রিপ্ট রাইটার হবার। কিন্তু সেই সুযোগ দেবে কে ? কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে একটু আনমনা হয়েই সিনেমা দেখছিল ধৃতি। এমনসময় কলিং বেলটা বেজে উঠল। ধৃতি এই ফ্ল্যাটে আসার পর প্রথমবার তাঁর কলিং বেল বাজল। ধৃতি উঠে দরজা খুলে দিতেই দেখে ওয়াচম্যান হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা পোস্টকার্ড।

– ম্যাডাম, আপনার একটা চিঠি আছে

– চিঠি ? আমার নামে ?

– না, আসলে সুপ্রিয় স্যারের নামে চিঠি। কিন্তু আমাদের তো সব চিঠি পিওনবুকে রিসিভ করে নিতে হয়, তাই যে ঠিকানার চিঠি, তাঁকেই পৌঁছে দিই। সুপ্রিয় স্যার মারা যাবার পর আপনিই তো এসেছেন, তাই হিসেব মত এ চিঠি আপনাকে দেবার কথা। আপনি না নিলে নাও নিতে পারেন। শুধু এই খাতায় একটা সই করে দিন। আমার চাকরি বাঁচাই ...

– না, না, এনেছ যখন দাও। কিন্তু উনি মারা গেছেন মাসখানেক হল। সবাই জানে। এখন কে আবার ওঁকে চিঠি লিখছে ?

খাতায় সই করে চিঠিটা নিয়ে নিল ধৃতি। চিঠিটা লেখা হয়েছে দিন তিনেক আগে। গোটা গোটা হরফে লেখা –

বন্ধু সুপ্রিয়,

তোমার চিঠি যথারীতি পেয়েছি। এই নিঃসঙ্গ জীবনে তোমার চিঠিগুলোই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। তুমি লিখেছ "বিষণ্ন সকাল" নাকি দারুণ হিট হয়েছে। এ যে কতবড় আনন্দের সংবাদ, তা আমি তোমায় বলতে পারি না। তোমার কথামত আমি এই চিঠিতে নতুন গল্পটার শেষাংশ পাঠাচ্ছি। তুমি সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখ।

এর পরে সাত আট লাইনে একটা প্লটের শেষ অংশের খসড়া। যদিও মূল কাহিনির শুরুটা ধৃতি জানে না, তবে শেষটা যে জব্বর সেটা বুঝতে পারল।

চিঠির শেষে সই, *তোমার বন্ধু অরবিন্দ*।

ধৃতি চিঠিটা বার তিনেক পড়ল। পোস্টমার্ক ভিজে গেছে, তাই কোথাথেকে এসেছে বলা মুশকিল। তবে মাত্র তিন দিনে ডেলিভারি হয়েছে যখন, কাছাকাছিই হবে। কে এই অরবিন্দ? ভাবতে গিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল ধৃতির শিরদাঁড়া বেয়ে। সুপ্রিয় বসু মারা গেছেন এক মাস আগে। আর "বিষণ্ন সকাল" রিলিজ করেছে মাত্র দুই সপ্তাহ হল। তাহলে মৃত ব্যক্তি চিঠিতে ছবির সাফল্যের কথা জানালেন কীভাবে ?

। ৩ ।

জার্নালিজম ক্লাসের সময় সন্দীপ স্যার একটা কথা খুব বলতেন। প্রতিটা ভাল জার্নালিস্ট আসলে একজন ভাল গোয়েন্দা। এই চিঠি পড়ে ধৃতির মধ্যে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার ইচ্ছে উসকে উঠল। কিন্তু শুরু কোথা থেকে করা যায় ?

হাউজিং এর এই ফ্লোরে আর দুটোই ফ্ল্যাট। একটাতে থাকেন এককালের ডাকসাইটে অভিনেত্রী রোশনি মিত্র আর অন্যটায় ওয়েব সিরিজের উঠতি পরিচালক সাগ্নিক চ্যাটার্জী। দুজনেই একা থাকেন। রোশনির সঙ্গী অবশ্য বিরাট দুটো ল্যাব্রাডর কুকুর। ধৃতি দেখেছে প্রায়ই রোশনি এঁদের নিয়ে নিচে হাওয়া খাওয়াতে বেরোন। সুপ্রিয় বসুকে নিয়ে কিছু বলতে পারলে এই দুইজনই পারবেন। কিন্তু ধৃতি সবে তেইশ বছরের ইন্টার্ন। ওরা ধৃতিকে খুব একটা আমল দেবেন বলে মনে হয় না। আর গায়ে পড়ে প্রশ্ন করাটাও ধৃতির কেমন কেমন লাগছিল।

সুযোগ এসে গেল ভাগ্যক্রমে। পরের দিনই রোশনি তাঁর একটা কুকুর নিয়ে সবে বেরোচ্ছেন, ধৃতিও ঘর থেকে বেরিয়েছে নিচে নেমে কিছু কেনাকাটা করবে বলে। আচমকা কুকুরটা রোশনির হাত ছেড়ে সোজা ধৃতির গায়ে লাফ দিল। এমনিতেই কুকুরে ধৃতির বেজায় ভয়। গায়ে লাফিয়ে উঠতেই "মা গো" একেবারে অজ্ঞান। জ্ঞান হারাবার আগে সে রোশনির গলায় "কোকো, কোকো" শুনতে পেয়েছিল বেশ কয়েকবার।

জ্ঞান যখন ফিরল ধৃতি দেখল সে অন্য একটা ফ্ল্যাটে শুয়ে আছে। ফ্ল্যাটে প্রচুর জিনিসপত্র, কিন্তু অগোছাল। পাশের একটা ঘর থেকে দুটো কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সে সোফায় শুয়ে। পাশেই চেয়ারে উদ্‌বিগ্ন মুখে বসে আছেন অভিনেত্রী রোশনি মিত্র। তাঁর হাতে একটা কাচের গোল গ্লাস, তাঁর সেই গ্লাসের ভিতরের তরলটা যে কোকাকোলা না সেটা এই অবস্থাতেও বুঝতে পারল ধৃতি। সে চোখ মেলে তাকাতেই রোশনি হাতের গেলাস রেখে তাঁর পাশে এসে বসল।

– কী ব্যাপার ? এখন ঠিক আছ ?

মাথা নেড়ে কোনক্রমে হ্যাঁ বলল ধৃতি।

– আসলে আমারই ভুল। কোকোটা খুব দুরন্ত। ওঁর চেনটা আরও শক্ত করে ধরে রাখা উচিত ছিল। আয়াম স্যরি। আমি বুঝিনি তুমি এত ভয় পেয়ে যাবে।

ধৃতি ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। মাথাটা একটু টলমল করছে সে উঠে বসার চেষ্টা করল।

– আরে উঠতে হবে না। একটু রেস্ট নাও। শুয়ে শুয়েই কথা বল। আমি ডাক্তার ডেকেছিলাম। তিনি দেখে বলেছেন ভয়ের কিছু নেই। একটা প্রাইমারি শক। তোমার নাম কি ? কি কর ? বাড়ি কোথায় ?

– আমি ধৃতি রায়চৌধুরী। বাড়ি বোলপুর। এখানে নিউজ ২০ তে ইন্টার্নের কাজ করছি।

– ও জার্নালিস্ট ? তোমাদের বস অর্জুন তো আমার বেশ পরিচিত। ভাল ছেলে। এককালে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। আমার সিনেমাগুলোর রিভিউ ওই করত। এখন অনেকদিন কথা হয় না। তুমি ১৯ বি-তে এসেছ তাই না ?

– হ্যাঁ, সুপ্রিয় বসুর ফ্ল্যাট। আপনি নিশ্চয়ই চিনতেন ওঁকে ?

মুখে অদ্ভুত একটা হাসি খেলে গেল রোশনির। এ হাসি আনন্দের না। দুঃখের।

– যে আমার জীবন শেষ করে দিল, তাঁকে চিনব না ?

– মানে ? কীভাবে ?

"তুমি বাচ্চা মেয়ে। কলকাতায় থাক না তাই জান না। নইলে সবাই জানে", হাতের গেলাসে এক সিপ দিয়ে বলল রোশনি। "বছর দুয়েক আগেকার কথা। আমার স্বামী, মেয়ে তখন আমার সঙ্গেই থাকতেন। এই ফ্ল্যাটেই। আমার স্বামী কর্পোরেট সার্ক। প্রায়ই এদেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতেন। মেয়ে হোস্টেলে। সেই সময় আমার প্রযোজক রাজীব

আগরওয়ালের সঙ্গে আমার একটা রিলেশান হয়। গোপনে। যাতে কেউ না বুঝতে পারে, তাই গভীর রাতে ও আমার ফ্ল্যাটে যাতায়াত করত। বুড়ো সুপ্রিয়র রাতে ঘুম আসত না। দরজায় কাচে চোখ লাগিয়ে বসে থাকত কে কী করছে। গোপনে ক্যামেরায় আমার ঘরে রাজীবের ঢোকার আর বেরোনোর ছবি তুলেছিল। টাইম সমেত। তারপর মোটা টাকায় বেচেছিল মিডিয়াকে। স্ক্যান্ডাল তো একটা হলই। বর ডিভোর্স দিল। মেয়ে আজকাল আর আমার কাছে আসে না।

ধৃতি দেখল রোশনির দুই গাল বেয়ে জলের ধারা নামছে। "কতক্ষণ আর এই কুকুরদের নিয়ে থাকতে ভাল লাগে বল তো? রাজীব নিজে স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়ে। ওরও বউ বাচ্চা আছে। ওঁকে কেউ বোঝায় আমিই নাকি পাবলিসিটির জন্য এটা করেছি। সেই থেকে হাতে কাজও নেই।" এবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন রোশনি। ধৃতি একটু ইতস্তত করে তাঁর হাতে হাত রাখল।

– শুধু কি আমার সর্বনাশ করেছে শয়তানটা ? সাগ্নিকের যা ক্ষতি করেছে কী বলব। ওঁর ক্যারিয়ারও তো দায়িত্ব নিয়ে শেষ করেছিল ওই কুচুটে বুড়ো।

– কী ভাবে ?

– সেটা সাগ্নিক ভাল বলতে পারবে। আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তোমার সঙ্গে কথা বলে অনেকদিন পর একটু হালকা লাগছে। মাঝে মাঝে এস, কেমন ? মিষ্টি মেয়ে তুমি ... নাম যেন কী বললে ? কৃতি ?

– না, না ধৃতি ... আচ্ছা সুপ্রিয়বাবু মারা গেলেন কী ভাবে ?

– শুনেছি তো ঘরে মই থেকে পিছলে পড়ে। এক হিসেবে ভালই হয়েছে। পাপের শাস্তি পেয়েছে। না হলে কোনদিন আমিই শয়তানটাকে খুন করতাম। আমায় দেখলেই গা জ্বালানো একটা হাসি দিত। মনে হত দৌড়ে গিয়ে গলাটা টিপে ধরি ...

। ৪ ।

– তুমিই ধৃতি? রোশনি তোমার কথা বলেছিল ... বস। চা খাবে ? না অন্যকিছু ?

– না, না, কিচ্ছু খাব না। জাস্ট কয়েকটা প্রশ্ন ছিল।

– বল, কী প্রশ্ন ?

– রোশনিদির ঘরে সেদিন কথা হচ্ছিল। শুনলাম সুপ্রিয়বাবু ওঁর কি সর্বনাশ করেছেন। দিদি বললেন আপনারও নাকি ক্ষতি করেছেন উনি ? কী ক্ষতি সেটাই ...

– জেনে কী লাভ বলত ? সে তো প্রায় বছর দেড়েক হয়ে গেল। তুমি কি আবার এই নিয়ে স্টোরি করবে ? শুনলাম তুমি নাকি জার্নালিস্ট ?

– আরে না, না। জাস্ট কৌতুহল। যার ফ্ল্যাটে আছি, সে লোকটা কেমন ছিল জানতে ইচ্ছে করল, তাই ...

– শুয়োরের বাচ ... পার্ডন মাই ল্যাংগুয়েজ। কিন্তু অতবড় অসভ্য লোক আমি লাইফে দেখিনি। মরাল ভ্যালুজ বলে কিস্যু ছিল না। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের সিনেমায় চান্স দেবে বলে ফ্ল্যাটে নিয়ে আসত। তারপর ... বুঝতেই তো পারছ। তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু অন্যের পিছনে কাঠি করাটা ওঁর একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছিল। রোশনির ব্যাপারটা তো জানোই। আমার সঙ্গে যা করেছিল সেটাও খুব নোংরামি। আমি প্রথম যখন এই কমপ্লেক্সে আসি, খুব ভাল ব্যবহার

করত আমার সঙ্গে। মাঝে মাঝেই রাতে পার্টি হত। ওই দারুর পার্টি আর কী ... একদিন নেশার ঘোরে একটা দারুণ প্লট ওঁকে বলে দিলাম। শুনে বলল কাউকে না বলতে। ও নাকি এই থেকে স্ক্রিপ্ট করবে। আমরা দুজন মিলে প্রডিউসারকে ধরে ছবি বানাবো। ওই সব ব্যবস্থা করে দেবে। কিছুদিন পরে দেখি সেই প্লটে সিনেমা রিলিজ করে গেল। প্রডিউসার ঠিক আছে, স্ক্রিপ্ট রাইটার ঠিক আছে। শুধু আমি বাদ। সিনেমা ব্লকবাস্টার হিট। "চব্বিশে আষাঢ়" দেখেছ নিশ্চয়ই। ভেবে দেখ। ওটা আমি করলে আমার লাইফ পুরো চেঞ্জ হয়ে যেত। শুনেছি এটা পাওয়ানোর জন্য সেই পরিচালক ওঁকে লাখ পাঁচেক টাকা উপরিও দিয়েছিল।

– কিন্তু এত টাকা দিয়ে করতেন কী ?

– সে আমি কী করে বলব ? খরচা ছিল নিশ্চয়ই কিছু

– সুপ্রিয় বাবু মারা যাওয়াতে তাহলে ...

– সত্যি বলব ? হেবি খুশি হয়েছি। হাতে কাজ নেই। এই ফ্ল্যাটের ভাড়া কতদিন দিতে পারব জানি না। তবু এই একটাই খুশির খবর। বুড়োটা মরেছে। মাঝেমাঝেই দেখতাম সিঁড়ি বেয়ে নামছে। মনে হত দিই একটা ঠেলা ...

। ৫ ।

ধৃতি ঘরে এসে বড় এককাপ কফি বানায়। ভাবতে বসে। সুপ্রিয় বসু বেঁচে থাকতেই প্রচুর শত্রু বানিয়েছিলেন। এঁদের যে কেউ তাঁকে খুন করতেই পারত। কিন্তু তা হল না। সুপ্রিয় মারা গেলেন বন্ধ ঘরে। ঘরাঞ্চি থেকে উলটে পড়ে। "পিওর অ্যান্ড সিম্পেল অ্যাক্সিডেন্ট"। পোস্টমর্টেমে খুনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। তাঁকে শেষ জীবিত দেখেছিল ওয়াচম্যান সুদীপ। এই সুদীপই কিছুদিন আগে তাঁকে সেই পোস্টকার্ড এনে দিয়েছিল।

কফির কাপ সাইড টেবিলে রেখে ধৃতি দরজা বন্ধ করে, পায়ে স্লিপার গলিয়ে নিচে নামল। মূল দরজার পাশেই একটা চেয়ারে সুদীপ বসে আছে। হাতে একটা বই। দেখে বেশ অবাক হল ধৃতি। ওয়াচম্যান যে পড়ুয়াও হয় তা তাঁর আগে ধারণা ছিল না। ধৃতি আসতে দেখতে পায়নি সুদীপ। যখন দেখল, তখন চমকে উঠে দাঁড়ালো। আঙুল বইয়ের পাতায় গোঁজা।

– কি বই পড়ছ সুদীপ ?

– দূরবীন। শীর্ষেন্দুর।

– তুমি বই পড়তে ভালবাস ?

– ওই একটাই তো নেশা ম্যাডাম। ফেসবুক করি না, পাবজি খেলি না। বই পড়ি।

– তা বেশ। তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। ফাঁকা আছ ?

– হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন।

– তুমি বস। বসেই কথা বল। দাঁড়াতে হবে না।

সুদীপ একটু ইতস্ততঃ করে চেয়ারে বসল।

– তুমি সুপ্রিয় বসুকে চিনতে ?

– আজ্ঞে আমি ওয়াচম্যান। হাউসিং এর সবাইকেই চিনতে হয়।

– উনি যেদিন মারা যান, সেদিন তুমি আর কাজের মহিলা তাঁকে শেষ দেখেছিলে ?

– কাজের মহিলা না। আমি দেখেছিলাম। সেদিনও ওঁর নামে একটা পোস্টকার্ড এসেছিল। দিতে গিয়ে দেখি কাজের মেয়ে কানন বেরিয়ে আসছে। আমায় বলল বাবু লাইব্রেরী রুমে বই গোছাচ্ছেন। আমি ঢুকলাম। দেখি সত্যিই তাই। আমি বললাম, এতো উপরে উঠে বই সাজাচ্ছেন, মাথা ঘুরে গেলে তো মুশকিল। উনি বললেন কিচ্ছু হবে না। তারপর খানিক এদিক ওদিক কথা হল। আমি ওঁর টেবিলে পোস্টকার্ড রেখে দরজা টেনে চলে এলাম।

– দরজা বাইরে থেকে টানলে লক হয়ে যেত ?

– হ্যাঁ, ইয়েল লক। পরদিন কানন এসে অনেক দরজা ধাক্কায়। দরজা খোলে নি। কানন আমাকে জানায়। আমি সোজা পুলিশে ফোন করি। তারপর তো আপনি জানেনই।

– তুমি বললে ওঁর সঙ্গে তোমার এদিক ওদিক কথা হত। কী কথা ?

– আমি গ্র্যাজুয়েট। চাকরি পাই নি। তাই এই কাজ করছি। কিন্তু বই পড়তে ভালবাসি। উনি আমাকে নানা রকম বই দিতেন পড়তে। পড়া হলে অনেক সময় জানতে চাইতেন বই কেমন লাগল। এই রকম কথা আর কি ...

– সেদিন কী নিয়ে কথা হচ্ছিল?

– সেদিন আমি বললাম, আমি আপনাকে হেল্প করব ? উনি বললেন তাহলে তোমার গেট দেখবে কে ? বললাম গোপাল আছে। আমরা তো দুইজন থাকি। উনি বললেন দরকার নেই। চলে আসছিলাম, এমন সময় বললেন ঠিক আছে, নিচের বইয়ের ডাঁইটা একটু তুলে দাও। দিলাম। তারপর উনি বললেন "তুমি যাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে।" আমিও চলে এলাম।

– আচ্ছা এই পোস্টকার্ডের কেসটা কী বলত ? আজকের দিনে কেউ পোস্টকার্ড লেখে ?

– তা জানি না ম্যাডাম। মাসে চারপাঁচবার এই চিঠি আসত। আমিও একবার স্যারকে বলেছি। উনি হেসে বলেছেন, লেখে লেখে। পুরোনো বন্ধুরা লেখে। আর কিছু বলেন নি।

। ৬ ।

ঘরে এসে ধৃতি দেখল কফি ঠান্ডা জল হয়ে গেছে। সেটাকে মাইক্রোওভেনে রেখে তিরিশ সেকেন্ড টাইম দিয়ে চালিয়ে দিল। এই পোস্টকার্ড তাহলে এই প্রথম না। আরও আছে। কোথায় ? পুলিশ যদি না নিয়ে থাকে (সেটার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ তদন্ত হয়নি বললেই চলে) তাহলে সেগুলো এখনও লাইব্রেরিতেই আছে। লাইব্রেরী রুমের দরজা খুলল ধৃতি। বইয়ের একটা সোঁদা গন্ধ ভেসে এল নাকে। রুমের সিলিং অবধি ঠাসা বই। মাটিতেও কিছু বই স্তূপ করে রাখা। ধৃতি এই ঘরে আগেও এসেছে। পছন্দমত দু-একটা বই নিয়ে পড়তে। এক কোণে সেই কাঠের ঘরাঞ্চি। এটা থেকে পড়েই মারা গেছিলেন সুপ্রিয়। ধৃতির শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু বই না, তাঁকে খুঁজতে হবে সেই চিঠিগুলো, যেগুলো নিয়মিত পেতেন তিনি, আর উত্তরও দিতেন – এমনকি মারা যাবার পরও।

খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই বাদামী চামড়ায় মোড়া একটা অ্যালবাম পেল ধৃতি। কালো মোটা কাগজে আঠা দিয়ে লাগানো সেপিয়া টোনের ছবি। উপরে পাতলা সেলোফেন পেপার। বেশিরভাগই পুরোনো দিনের নায়ক নায়িকা বা পরিচালকের সঙ্গে ছবি। সত্যজিৎ রায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছবিটা দেখে অবাক হল ধৃতি। এ ছবি আগে দেখেনি।

প্রতি ছবির নিচে কুশীলবদের নাম কাগজে লিখে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া। একটা ছবি দেখে দাঁড়িয়ে গেল ধৃতি। ধুতি পরা গোবেচারা মত এক ভদ্রলোকের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বেলবটম প্যান্ট আর বুক খোলা জামা পরা যুবক সুপ্রিয়। পিছনে একটা সিনেমার সেট। নিচে লেখা "আমি আর অরবিন্দ" দূরের বলাকা ছবির সেটে।

ধৃতির এক বন্ধু আছে স্যমন্তক। পুরোনো বাঙলা ছবির এনসাইক্লোপিডিয়া। তাঁকেই ফোন লাগাল ধৃতি।

– হ্যালো স্যমন্তক, শোন না, একটা দরকারে ফোন করলাম

– বুঝেছি। কারণ দরকার ছাড়া তুই কখনো ফোন করিস না। বল ...

– বাজে কথা বলিস না। শোন না, তুই দূরের বলাকা সিনেমার ব্যাপারে জানিস ?

– হ্যাঁ, সুপার হিট সিনেমা। রঞ্জিত মল্লিক ছিল। কেন ?

– সেই সিনেমায় সুপ্রিয় বসু স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিলেন ?

– হ্যাঁ। তবে একা নয়। অরবিন্দ-সুপ্রিয় স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন

– এই অরবিন্দ কে ?

– আরে এই তো আসল মানুষ। সুপ্রিয় ড্যাসিপুশি ছিল। প্রোডিউসার ধরত। আর অরবিন্দ গুপ্ত লিখত। মুখচোরা মানুষ। কিন্তু ডায়লগ লিখতেন যখন তখন বাঘের বাচ্চা। বাংলার সেলিম-জাভেদ বলা হত এঁদের। আশির দশকের মাঝামাঝি অরবিন্দ বাবুর কি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে স্মৃতি চলে যায়। তারপর থেকে কোন খবর নেই। মরে টরে গেছে বোধহয়। কেন তোর কি দরকার ?

– না আসলে সুপ্রিয়কে নিয়ে একটা স্টোরি ভাবছি। থ্যাঙ্ক ইউ রে ...

অরবিন্দ মারা যায় নি। সে এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে। অন্ততঃ তিনদিন আগেও ছিল। কিন্তু কোথায় ? চিঠিগুলো না পেলে এর সমাধান হবে না। ধৃতি এবার পাগলের মত খুঁজতে থাকল এদিক ওদিক। কোন লাভ নেই। শেষে চোখ গেল তাকের একেবারে মাথায়। সিলিং এর কাছে একটা সুটকেস মত কী দেখা যাচ্ছে!! দুরুদুরু বুকে কাঠের ঘরাঞ্চিটা দাঁড় করিয়ে মাথায় উঠল ধৃতি। ওপর থেকে নিচটা কত দূরে মনে হচ্ছে। এখান থেকে পড়লে সত্যিই আর রক্ষা নেই। হাত বাড়িয়ে পেল বাক্সটা। একটা কাঠের বাক্স। বেশ ভারী। অতিকষ্টে নামিয়ে আনল নিচে। তালা মারা নেই, তাই খোলার ঝামেলা হল না। খুলেই ধৃতি দেখতে পেল সে যা চাইছে, তা সব বান্ডিল বান্ডিল করে রাখা। রবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা গোছা গোছা পোস্টকার্ড। সবচেয়ে নতুন যেটা মনে হল সেই বান্ডিলটা খুলে পড়তে শুরু করল ধৃতি। অরবিন্দবাবু কিস্তিতে কিস্তিতে একটা গল্প পাঠিয়েছেন। প্রতিটাতেই এরকম একটা না একটা গল্প লেখা। তবে এটা ধৃতি জানে। কিছুদিন আগে হলে দেখা "বিষণ্ন সকাল" সিনেমার গল্প। কিন্তু চিত্রনাট্যকার হিসেবে একজনেরই নাম ছিল। সুপ্রিয় বসু।

গোটা জটটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে ধৃতির সামনে। কুয়াশাটা স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমে। সুপ্রিয় বসু আসলে অরবিন্দ গুপ্তের প্লট চুরি করতেন। কিন্তু অরবিন্দ কিছু বলতেন না কেন ? বরং শেষ চিঠিতে লিখেছেন উনি আনন্দিত! এরকম তো হবার কথা না। পোস্টকার্ডে ঢাকুরিয়ার ছাপ। ঠিকই ধরেছে। কাছাকাছি থেকেই আসত এই চিঠি। কিন্তু এই যুগে পোস্টকার্ড !! আচমকা একটা ডায়রিতে চোখ পড়ল ধৃতির। সুপ্রিয়র প্রতিবছরের আয় ব্যায়ের হিসেব। সেটা দেখতে গিয়েই চমক! প্রতি বছর প্রায় ছয় লাখ টাকা করে সুপ্রিয় দিতেন দি রিট্রিট নামে কোন এক সংস্থায়। সাগ্নিক চ্যাটার্জী বলেছিলেন সুপ্রিয়র টাকার দরকার থাকে সবসময়। এদেরকে দিতেই? কারা এরা? ধৃতি দ্রুত গুগল করল। কিছুটা

আন্দাজ করেছিল। এবার সিওর হল। দ্য রিট্রিট এক মানসিক রোগীদের প্রাইভেট হোম। সবচেয়ে দামী আর পশ। ঢাকুরিয়ার কাছেই। ধৃতি বুঝল সে অরবিন্দ গুপ্তের ঠিকানা পেয়ে গেছে।

। ৭ ।

হোমের চকচকে মেঝে পেরিয়ে রিসেপশনিস্টের কাছে যেতেই তিনি ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

– কি চাই ?

ধৃতি আই কার্ড বার করল।

– আমি নিউজ চ্যানেল থেকে আসছি। আপনাদের এখানে বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার অরবিন্দ গুপ্ত ভর্তি আছেন অনেকদিন হল। আমি ওঁকে নিয়ে একটা স্টোরি করতে চাই।

ভদ্রমহিলার মুখটা অদ্ভুত বেঁকে গেল।

– বাবা, এতদিন আছেন উনি। আজ অবধি কাউকে তো দেখা করতে দেখলাম না। আজ সোজা সাংবাদিক! খবর পেলেন কোথা থেকে ?

– ওঁর এক আত্মীয় আমায় সেদিন বললেন।

শুনে ভদ্রমহিলা আরও চটে গেলেন।

– কে সেই আত্মীয় ? আজ অবধি একদিন দেখা করতে আসে নি!! শুনুন তাঁকে বলে দেবেন সুপ্রিয় বসু এত বছর টাকা দিয়ে চালাচ্ছিলেন তাই উনি আছেন। সুপ্রিয় বাবুও তো মারা গেছেন মাসখানেক হল। এই বছরের টাকা সামনের মাসেই শেষ। তখন রিনিউ না করলে আমাদের পক্ষে আর ওঁকে রাখা সম্ভব না। এই ফাইভ স্টার খাতির কোথায় পাবেন শুনি ? সোজা সরকারী হোমে রেখে আসব।

ধৃতি বুঝল এঁকে চটালে চলবে না। হাসিমুখে বলল, "অবশ্যই জানাবো। অরবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা করা যাবে ?"

মহিলা গোমড়া মুখে "মহুয়া, অ্যাই মহুয়া এঁকে একটু অরবিন্দ বাবুর কাছ নিয়ে যা তো" বলায় কোথা থেকে একটা ছোট্টখাট্ট মেয়ে এসে ধৃতিকে বলল "আমার সঙ্গে আসুন।"

এই মেয়েটি বেশ নরম সরম। ধৃতি যেতে যেতেই জিজ্ঞেস করল – কী হয়েছিল ওঁর ?"

– শুনেছি একটা অ্যাকসিডেন্টে মাথার ডান দিকে চোট পান। তারপর এখন অদ্ভুত অবস্থা। মনে মনে উনি এখনও আশির দশকেই আছেন। রাশিয়ার কথা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কথা বলেন, পোস্টকার্ডে চিঠি লেখেন ..."

– কাকে লেখেন ?

– সুপ্রিয় বাবুকে। ওঁর বন্ধু। উনিই ওঁর এখানের খরচ দেন।

– কী লেখেন জানো ?"

– বলেন তো গল্প। কিন্তু টানা লিখতে পারেন না। অল্প অল্প করে লেখেন। আমি গিয়ে ডাকে ফেলে আসি।

– সুপ্রিয় বাবু আসতেন না ?

– অনেকদিন আগে একবার এসেছিলেন। অরবিন্দবাবু চিনতে পারেন নি ... এই যে ওঁর ঘর ...

বলে একটা ছোট ঘর খুলে দিল মহুয়া। কাচের জানলা দিয়ে আলো ঢুকছে। ঘরে আসবাব বিশেষ কিছু নেই। একটা ছোট বইয়ের আলমারি। একটা টেবিল, চেয়ার আর খাট। টেবিলে বসে বৃদ্ধ অরবিন্দ কী যেন লিখছেন। ধৃতি এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক তাঁকে খেয়াল করেন নি। খুব নরম করে ধৃতি বলল " ভাল আছেন অরবিন্দবাবু ?"

চমকে উঠলেন তিনি, – "আপনি ? আপনি কে ?"

– আমি ধৃতি। সুপ্রিয় বসুর নতুন সেক্রেটারী।

– ও বাবা, সুপ্রিয় সেক্রেটারিও রেখেছে! আজ কদিন ওঁর চিঠি পাই না। কী ব্যাপার ?

– উনি একটু ব্যাস্ত আজকাল। আপনাদের সিনেমা তো সব সুপারহিট!

হাসি ফুটল ভদ্রলোকের মুখে, – আমিও শুনি, জানো। খুব ইচ্ছে হয় দেখতে যেতে। কিন্তু এখানে কড়া নিয়ম। বেরোনো মানা। কটা হলে রিলিজ করেছে, কত টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে, সব আমায় বলে সুপ্রিয়। এবারে নাকি মিনার, বিজলী, ছবিঘর, তিনটেতেই হাউসফুল ছিল ?"

– হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছেন। আচ্ছা অরবিন্দবাবু, সুপ্রিয় বাবুর শেষ চিঠিটা একটু দেখাবেন ?

"এই এই তো ... এই তো আমার পাশেই আছে" ধৃতির হাতে পোস্টকার্ড তুলে দিলেন অরবিন্দ গুপ্ত।

সিনেমা রিলিজের পরের দিনের চিঠি। হাতের লেখা সুপ্রিয়র কায়দায়। কিন্তু সুপ্রিয়র না। তাতে লেখা –

বন্ধু অরবিন্দ,

আমাদের যৌথ ছবি "বিষণ্ন সকাল" সুপারহিট হয়েছে। এখন যে গল্পটা লিখছ সেটার শেষ অংশটা পাঠাও। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় আগ্রহ দেখিয়েছেন। তুমি শেষ অংশ পাঠালেই আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব

ইতি

সুপ্রিয়

এখন প্রশ্ন একটাই। এ চিঠি কে লিখল ? আর তাঁর চেয়েও বড় প্রশ্ন ... কেন?

ফিরে গেটে সুদীপকে দেখতে পেল না ধৃতি। গোপালের সঙ্গে নতুন একটা ছেলে বসে আছে। কি ব্যাপার ? সুদীপ কি চাকরি ছেড়ে দিল ? পড়াশুনো করা হাসিখুশি এই ওয়াচম্যানকে কখন যে বেশ পছন্দ করতে শুরু করেছিল ধৃতি, নিজেই জানে না।

– কি ব্যাপার গোপাল ? সুদীপ কোথায় ?

– চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ম্যাডাম

– কেন?

– ওঁর এখন বিশাল ব্যাপার। পড়াশুনোতে তে বরাবরই ভাল। কি একটা গল্প লিখে সেদিন আমাদের ডিরেক্টার সাগ্নিকবাবুকে শুনিয়েছে। উনি তো শুনেই খুশ। দুজনে গেছিল শ্রী বালগোপাল ফিল্মস-এ। ওরা নাকি লাখ পাঁচেক দিয়ে

গল্প কিনে নিয়েছে। ও গল্পে ছবি হবে। সুদীপ আর এই কাজ করবে না। সিনেমার কাজই করবে ... লাইফ বদলে গেল ম্যাডাম ওঁর ...

ধৃতি হেসে বলল " বাহ রে! বেশ তো! ওঁকে অভিনন্দন জানাতে হবে। ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা একটু দেবে ? দরকার ছিল"।

উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি গলি। উবের ড্রাইভার বলল ঢুকবে না। একটু এগিয়ে গিয়ে দু একজনকে জিজ্ঞেস করতেই বাড়ি দেখিয়ে দিল। পুরোনো প্রায় ভেঙে পড়া শরিকি বাড়ি। সুদীপ বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। ধৃতিকে দেখে চমকে উঠল "ম্যাডাম, আপনি? এখানে?"

– তোমার সুখবরটা পেলাম। গোপাল বলল। তাই মিষ্টি দিতে এলাম।

সুদীপের ঘোর যেন কাটেনি। আমতা আমতা করেই বললে "আসুন ম্যাডাম। ভিতরে আসুন।"

ঘরের ভিতরটা অগোছালো। অবিবাহিত ছেলেদের যেমন হয় আর কি। খাটে বেশ কিছু বই রাখা। একটা বই খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। সেই খাটের এক কোনায় বসল ধৃতি। হাসিমুখে সুদীপের হাতে মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে শান্ত গলায় বলল, "এবারে বল, সুপ্রিয় বসুকে তুমি কেন খুন করলে?"

। ৮ ।

খানিকক্ষণ ধৃতির মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইল সুদীপ। চোয়াল শক্ত। গলার কাছটা দপদপ করছে। বেশ খানিক বাদে প্রায় ফিসফিসে গলায় বলল, "আপনাকে কে বলেছে ?"

– কেউ না। আমিও কাউকে বলব না। জাস্ট কৌতুহল।

– আপনি বুঝলেন কী করে ?

– যে কোন হত্যায় সন্দেহ সবার আগে তাঁর ওপরেই পরে যে মৃত ব্যক্তিকে শেষ দেখেছে। মানে এইক্ষেত্রে তুমি। কিন্তু মজাটা হল আপাতদৃষ্টিতে তোমার কোন মোটিভ নেই। তাই হু মিলে গেলেও হোয়াই-তে আটকে যাচ্ছিল বারবার। সুপ্রিয় বসু অসৎ মানুষ ছিলেন। অরবিন্দ বাবুর মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁকে দিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে গল্প লেখাতেন আর সেই গল্প নিজের নামে চালাতেন। একথা কারও জানার কথা না, কারণ অরবিন্দ বাবু তো ভাবছেন ছবিতে দুজনের নামই থাকছে। তাহলে এই পোস্টকার্ডের গল্পের কথা আর কে জানতে পারে ? সেই লোক যে এটা ঘরে পৌঁছে দেয়। বিশেষ করে সে যদি পড়ুয়া হয়, আর পড়ার বইয়ের অভাব থাকে তবে সে হাতের কাছে যা পায় পড়ে। আমার বিশ্বাস ঠিক এটাই তোমার সঙ্গে হয়েছিল। তুমি বুঝতে পেরেছিলে কেউ একজন চিঠিতে গল্পের প্লট লিখে পাঠাচ্ছে আর পোস্টকার্ড হওয়াতে পড়াও সুবিধে। সুপ্রিয় বাবু যেদিন মারা গেলেন, সেদিন তুমি তাঁর ঘরে চিঠি নিয়ে গেলে। তিনি তখন ঘরাঞ্চির মাথায়। আমি নিজে উঠে দেখেছি অত উপর থেকে পড়লে বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। তুমি পোস্টকার্ড পড়ে বুঝেছিলে আর একটা নতুন গল্প শেষ হতে চলেছে। হলেই সুপ্রিয় সেটাকে নিয়ে সিনেমা বানাবেন। দেখলে এই সুযোগ। ঘরাঞ্চিতে ঠেলা দিতেই সুপ্রিয় বসু মাটিতে ঘাড় মটকে পড়ে গেলেন। তুমি তাঁর নাড়ি দেখলে। তিনি মারা গেছেন। খুব সাবধানে ঘরাঞ্চি থেকে হাতের ছাপ মুছে তুমি দরজা লাগিয়ে বেরিয়ে এলে। এখন শুধু একটাই ফাঁক রয়ে গেল। গল্পের শেষটুকু তোমার জানতে হত। যদি ভুল না করি, সুপ্রিয় বসুর চিঠিও তুমিই ডাকে ফেলতে, জানতে হাতের লেখা কী রকম। হাতের লেখা নকল করে অরবিন্দকে চিঠি লিখলে। গল্প এল। তুমি গোটা গল্প বাড়িয়ে নিজের নামে সাগ্নিক চ্যাটার্জীকে শোনালে, যেমন সুপ্রিয় করতেন। আর তারপর ... তোমার লাইফ বদলে গেল। কিন্তু

কয়েকটা ব্যাপার একটু বল দেখি। অরবিন্দবাবু যে মানসিক রোগী, হাতের লেখার বদল ধরতে পারবেন না এই খবরটা তুমি পেলে কোথা থেকে ?

– আমার প্রেমিকা। মহুয়া। ও রিট্রিটে কাজ করে। ওই আমাকে এই চিঠিগুলোর কথা প্রথম বলেছিল। কিন্তু আপনি যা বললেন তাঁর অনেকটাই ভুল। আমি গল্পের লোভে খুন করিনি। ইনফ্যাক্ট আমি খুনই করিনি। কলেজে দারুণ লেখালেখি করতাম। ম্যাগাজিনের এডিটার-ও ছিলাম। তারপর বাবা মারা গেলেন। মা আগেই গেছিলেন। চাকরি নেই। উপায় না দেখে ওয়াচম্যানের কাজ নিলাম। ভাল লাগত না, জানেন। একদিন সুপ্রিয় স্যারের সঙ্গে আলাপ হল। চিঠি দিতে গিয়েই ... বললাম আমিও লেখালেখি করি। উনি খুব উৎসাহ দেখালেন। আমি কলেজে ম্যাগাজিনের লেখা একটা গল্প পড়ালাম। বললেন বেড়ে হয়েছে। আমি বললাম, এ থেকে সিনেমা হয় না ? উনি বললেন প্রযোজককে বলবেন। দুই হপ্তা বাদে জানালেন গল্প রিজেক্ট হয়েছে। ছয়মাস গেল না, গোপাল দেখি একটা ওয়েব সিরিজের গল্পের খুব প্রশংসা করছে। মোবাইলে দেখালো। চমকে উঠলাম। এতো হুবহু আমার লেখা গল্প! কিচ্ছু বলিনি জানেন। ঘরে এসে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছি। যেদিন স্যার মারা গেলেন, সেদিন ওঁর ঘরে গেছিলাম চিঠি দিতে। ঘরাঞ্চির মাথায় উনি। নিচে আমি। খুব ইচ্ছে করছিল দিই ঠেলা। পারলাম না। ভদ্রঘরের ছেলে তো! উনি বললেন বইয়ের ডাঁই তুলে দিতে। দিতে গিয়ে ব্যালেন্স হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ঘরাঞ্চিতে। ঘরাঞ্চি কাত হয়ে গেল। উনি সোজা নিচে। যখন বুঝলাম মারা গেছেন, প্রথমে ভয় হল। তাড়াতাড়ি দরজা আটকে বেরিয়ে এলাম। সেদিন সারারাত ঘুমাতে পারি নি। পরে দেখলাম তেমন কোন তদন্ত হল না। তখন এল লোভ। অরবিন্দবাবুর গল্পের পুরোটাই তো জানা। শুধু শেষটা জানতে বাকি। চিঠি লিখলাম সুপ্রিয় স্যারের হাতের লেখা নকল করে। বাকিটা তো আপনি জানেন। আচ্ছা, আপনি কি পুলিশে যাবেন ?

ঘাড় নাড়ল ধৃতি, "না। শুধু একটাই প্রশ্ন। আমাকে চিঠিটা দিলে কেন ? না দিলেও তো পারতে ... তাহলে এত কিছু হতই না"

– পিওনবুকে রিসিভ করে নিয়েছিলাম যে। দিতেই হত। আমাদের খাতায় চিঠি বা পার্সেল ডেস্প্যাচ করে রিসিভ করিয়ে নিতে হয়। একবার একটা পার্সেল খোওয়া গেছিল। সেই থেকে। তবে ভেবেছিলাম আপনি রিসিভ করবেন না। করলেও পাত্তা দেবেন না। এতকিছু হয়ে যাবে বুঝতেই পারিনি। একটা কথা ম্যাডাম, আমার জীবন এতদিনে অন্যদিকে ঘুরছে। প্লিজ, প্লিজ, কাউকে কিছু বলবেন না।

। ৯ ।

তিনদিন বাদে আবার রিট্রিটে গেল ধৃতি। সেই মহিলাই বসে আছেন রিসেপশানে। একটা এক লাখের চেক দিয়ে ধৃতি বলল, "এখন থেকে অরবিন্দ বাবুর খরচা আমিই দেব। একটু ওঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে।"

এই প্রথম হাসি ফুটল মহিলার মুখে।

"মহুয়াকে ডাকতে হবে না। আমি চিনি", বলে পা বাড়ালো ধৃতি।

আবার সেই ঘর। অরবিন্দ বসে আছেন চেয়ারে। ধৃতি হেসে বলল, "আমায় চিনতে পারছেন ? সুপ্রিয় বাবুর সেক্রেটারী"।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ ... চেনা চেনা লাগছে ।

– আপনার আগের গল্প থেকে সিনেমা হচ্ছে। সত্যজিৎ বাবু রাজি হয়েছেন। এবার নতুন গল্প লিখতে হবে। মৃণাল সেন চেয়েছেন।

– বলেন কী ! আমার গল্পের এত কদর !!

চকচক করে ওঠে অরবিন্দের মুখ। তাঁর সামনে এক গোছা পোস্টকার্ড নামিয়ে রাখে ধৃতি।

"যেমন পাঠান, তেমনই পাঠাবেন। তবে একমাসের মধ্যে গল্প শেষ করতে হবে। ওঁদের একটু তাড়া আছে, কেমন ?"

অরবিন্দর বোবা হাসির উত্তরে মৃদু হেসে ধৃতি দরজার দিকে এগোয়। অদ্ভুত এক প্রশান্তি তাঁর সারা শরীর জুড়ে। রিট্রিট থেকে বেরিয়েই ফোন বার করে একটা নম্বর ডায়াল করল ধৃতি। বারদুই রিং হবার পর অপরপক্ষ ধরল।

"হ্যালো, সাগ্নিকদা আমি ধৃতি বলছি। হ্যাঁ। হাউসিং এর ধৃতি। একটা দারুণ গল্পের প্লট মাথায় এসেছে। ভাল সিনেমা হবে ... হ্যাঁ, আপনাকেই দেব। তবে আমায় একমাস সময় দিতে হবে ..."

সোমা ঘোষ (চক্রবর্তী)

তারেই খুঁজে বেড়াই

আননোন নাম্বার থেকে ওয়াটস আপ কলটা চারবার এসে কেটে গেল। প্রজেক্ট সাবমিশনের ডেডলাইন পরশু। রাত জেগে পড়াশোনা করে মাত্র একঘন্টা আগে বেড়ে গেছে ট্রিনা। ঘুমটা সুপার গ্লুর মত দুচোখের পাতাকে জুড়ে রেখেছে, পাশ ফিরে ভালো করে কুইল্ট-টা টেনে নেয় গলা অব্দি, ম্যাট্রেসের নরম গদিতে ডুবে যায়। কিন্তু তবু ঘুম ধীরে ধীরে ফিকে হতে থাকে আর চিন্তটা জাঁকিয়ে বসে।

ভোর চারটের সময় কে ফোন করছে ? +৯১ কোন দেশের কোড ? সে দেশে এখন কি দিন ? একটা অচেনা কল নিয়ে অযথা ভাববেনা সে আর। কিন্তু নাঃ, মাথা থেকে ফোনটা যাচ্ছে না। ঘুম দরকার, সকাল থেকে একটা বিজি লং ডে শুরু হবে। তার ফাঁকে একবার দেখে নিতে হবে কোন দেশ থেকে ফোনটা এল। রং নাম্বার হলে পর পর চারবার ডায়াল করতনা ! কে কোথা থেকে ফোন করল না জেনে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় কিভাবে ট্রিনা।

উঠে বসে আবার মোবাইলটা হাতে নেয়, গুগল সার্চ করে দেখল স্ক্রীন এ দেশের নাম ভাসছে – ইন্ডিয়া!!! ইন্ডিয়া থেকে ট্রিনা জন্সনের কাছে ফোন ? ঘামতে লাগল ট্রিনা, অস্থির হয়ে ওর হার্টবিট দ্রুত হল। জ্ঞান হয়েছে থেকে এই দেশের নামটার প্রতি ওর এক অমোঘ আকর্ষণ। আলাদা করে পড়াশোনা করেনি ইন্ডিয়া সম্পর্কে। প্রায় কিছুই জানেনা দেশটার কালচার বা মানুষজনের কথা। জানেনা সোশিও-ইকোনমিক স্ট্রাকচার। স্লাম ডগ মিলিয়েনেয়ার দেখেছে সে, দেখেছে আর শিউরে উঠেছে। নাঃ ইচ্ছে করেনি ওই দেশটায় পা রাখার কথা ভাবতে। তবু খেলা বা রাজনীতির খবরে যতবার উঠে এসেছে দেশটার নাম ও নিজের বুকের এই ধুকপুকুনি টের পেয়েছে।

মোবাইল বিছানার পাশে রেখে আবার শুয়ে পড়ে ট্রিনা। কার দরকার পড়ল তাকে ! ইউনিভার্সিটির কিছু ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়ে আছে বটে কিন্তু তারা কেউ ট্রিনার খুব কাছের বন্ধুবৃত্তে নেই। তাছাড়া তাদের সবার জন্ম ও বড় হওয়া এই ইংল্যান্ডেই। তাহলে কে ? তাহলে কি ..... ! চিন্তাটা ব্যাক অফ দা মাইন্ড এ ছিলই, এবার সামনে এসে তীব্র এক ঝাঁকুনি দিল ট্রিনাকে। উঠে বসল সে।

কি করবে ? পাশের ঘরে শোয়া মম ড্যাড কে জাগিয়ে তুলে বলবে মাঝরাতে দুঃস্বপ্নের মত উঠে আসা এই আলোড়নের কথা ? তা কি করে হয় ? এ তার একান্ত নিজস্ব জায়গা। কাউকে বলা যাবেনা। মম ড্যাডকেও না।

তখনই মেসেজ ঢোকার একটা আওয়াজ হল। ফোন হাতে তুলে নেয়, ইংলিশেই মেসেজ – 'হাই তুমি কি মিস ট্রিনা জনসন?' গুগল বলছে ওই দেশে এখন সকাল আটটা পঁয়ত্রিশ। ট্রিনা এবার ডায়াল করে +৯১ নম্বরটি, একটা করে রিং হয় আর অনন্ত সময় চলে যায়। ঢিপ ঢিপ ঢিপ প্রতিটা স্পন্দন আরও গভীর গম্ভীর একাকী ও সতন্ত্র, ট্রিনা অনুভব করে নিবিড় করে। ..... হাত পা তুষার শীতল কানের পেছনে একটা গরম হলকা। আনমনে কপালে ঘামের বিন্দু মুছল সে।

– হ্যালো .....

– হাই, কয়েকটা মিসড কল দেখলাম। কে কথা বলতে চাইছ ? কাকে চাইছ ?

না, ট্রিনার গলার স্বর স্বাভাবিক শোনাচ্ছে না। কেঁপে যাচ্ছে কি ?

– আমি রূপক সাহা। কলকাতা থেকে কথা বলছি, ট্রিনা জনসনকে চাইছি।

– কিভাবে তোমার উপকারে আসতে পারি ? কোথা থেকে আমার পরিচয় পেলে ?

রূপক একটু বেসামাল, তোড়ে বেরিয়ে আসা খোদ বিলেতের স্থানীয় এক্সেন্টে ইংলিশ শুনে, একটু দিশাহারা, সামলে নিয়ে বলে।

– পার্ডন !

ট্রিনা বোঝে এবং এবার কেটে কেটে বলে,

– তুমি একজন স্ট্রেঞ্জার এই মাঝরাতে আমাকে ফোন করছ কেন ? আমার পরিচয় কোথায় পেলে ?

– ও মাঝরাত এখন ? খুব দুঃখিত! আমি তোমাকে খুব ইম্পট্র্যান্ট কথা বলতে চাই। তুমিই কি ট্রিনা জনসন ?

– হ্যাঁ, আমি ট্রিনা। কি চাও ?

– আমি সব বলব, কিন্তু প্লীজ তুমি একবার আমার সাথে ভিডিও চ্যাট এ এসো।

অপরিচিত এ্যাক্সেন্টে মাতৃভাষাকে বুঝে নিতে মনোনিবেশ করে ট্রিনা।

– আমি একজন স্ট্রেঞ্জার এর সাথে ভিডিও চ্যাট করব কেন ?

– কারণ আমার তোমাকে খুব ইম্পট্র্যান্ট ইনফর্মেশন দেবার আছে। তুমি জানিও তুমি কখন পারবে। আমার স্কাইপ নাম্বার টেক্সট করছি।

কেটে গেল লাইনটা। হাজার চিন্তায় সকাল হয়ে গেল। সকালের দিকে একটু ঘুমিয়েও পড়েছিল ট্রিনা। হিজিবিজি আধো অন্ধকার স্বপ্নে অদেখা গলিপথ আর দুধারে তিন তলা বাড়ি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে, দেখতে পেল। যেন হ্যারি পটারের গল্পের কোনো অচিন শহর। এখুনি আকাশ কালো করে ব্রুম চড়ে উইজার্ডরা উড়ে আসবে।

(২)

লাবণ্যর শরীরটা ভাল যাচ্ছেনা আজকাল। খাওয়ায় রুচি নেই, কাজ করতে গেলে হাঁপিয়ে উঠছে। স্কুলে এই কয়েকমাস হল জয়েন করেছে রূপক নামের ছেলেটি। ওর মধ্যে কি পেয়েছে জানা নেই, বড় মায়ায় জড়িয়ে নিয়েছে। একলা লাবণ্যর কোনওরকম আসুবিধা নজরে এলেই জবরদস্তি সব দূর করার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। লাবণ্য সর্ব অর্থে স্বনির্ভর। চিরকাল সে জেদী, আত্মাভিমানে ভরপুর – এবং নিজের দায় নিজে বহন করেছে। কলিগরা এমনিতেই ওর খুব ভাল। এতগুলো বছর ধরে একাকীত্ব সেভাবে গ্রাস করেনি – সে তো ওরা পাশে আছে এই অনুভুতি ছিল বলেই। নিজের বলতে আর কে ই বা আছে তার। কিন্তু এই রূপক ছেলেটি যেন রক্তের তারে বাঁধা, এমনই তার আন্তরিকতা আর আধিকারবোধ। জবরদস্তি অনুপ্রবেশকারী এই মানুষটাকে কিছুতেই ঠেলে সরাতে পারেনি লাবণ্য। একা জীবনে অভ্যস্ত লাবণ্যর কেন জানি মনে হলনা তার নিজস্ব জায়গাটুকুতে হাত বাড়াচ্ছে কেউ। বরং নিশ্চিন্তে কিছুটা গা এলিয়ে দিয়েছে সে রূপকের ওপর। হয়তো ভেতরে সে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। হয়তো দীর্ঘ একাকীত্বের পর তারও একটু অবলম্বনের দরকার হয়েছিল। আসছে এপ্রিলে উনপঞ্চাশ পূর্ণ করে পঞ্চাশে পা রাখবে লাবণ্য। ছোটোবেলায় ফুটফুটে সুন্দর ছিল বলে বাবা সাধ করে নাম রেখেছিলেন লাবণ্য। বিনা চেষ্টায় চেহারা আর ব্যক্তিত্বের জৌলুশে সে বরাবর ছিল নজরকাড়া। কিন্তু মাস ছয়েক থেকে ধরে দেখছে ঘোর ক্লান্তির কালিমা দ্রুত ওর চোখে মুখে জাঁক করে জুড়ে বসছে। রূপ আছে এই জানাটা তার অভ্যেস, মাথা ঘামায়না কোনওদিন। কলিগদের সাজের কতই না বাহার! প্রতিদিন যেন শাড়ির এক্সিবিশন। তার সাথে নিত্য নতুন ফ্যাশন। দেখেতে ভালই লাগে, কিন্তু ও কবেই নিজের সৌন্দর্যের প্রতি নিঃস্পৃহ হয়ে গেছে। লাবণ্যও সাজত একটা সময়। ইউনিভার্সিটি যেতে শুরু করার পর। ওর জীবনে ওইটুকুই তো একমাত্র সুখের সময়। কলেজে ঢোকার পর থেকেই কত যে সম্বন্ধ আসতে শুরু করেছিল, মা বাবার জন্যে সে এক বিড়ম্বনা। মেয়ে উচ্চশিক্ষিত হবে নিজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করবে তারপরেই বিয়ের চিন্তা। যে মেয়ের এমন রূপ তার জন্যে সৎপাত্রের অভাব হবে না। দেশি বিদেশি কতশত বড় বড় ডাক্তার, এঞ্জীনীয়র, এ্যাডভোকেটের প্রলোভন হেলায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন লাবণ্যর বাবা।

কিন্তু লাবণ্য কোথায় দাম দিতে পারল বাবার উচ্চাশার? তীব্র মনোকষ্টে বাবা শেষবেলা দুরন্ত অভিমানে আর লাবণ্যর দিকে ফিরে তাকাননি। লাবণ্যর অধিকার ছিলনা বাবার স্বপ্নকে ছিন্ন করে দেবার। বাবা মা ওকে পরম বিশ্বাস করেছিলেন বরাবর। লাবণ্যকে শাসনের শৃঙ্খলে বাঁধার চেষ্টা না করে ওর মধ্যে স্বাধীন চেতনা গড়ে দিতে চেয়েছেন। সে জানে তার উচিত ছিলনা ওঁদের আঘাত করার, ভুল-বড় ভুল হয়ে গেল।

নতুন করে কেন যে আজকাল এসব ভাবতে বসে লাবণ্য। হঠাৎ করে কি বয়েস এসে জানান দিচ্ছে তাকে? বড় এক কাপ চা নিয়ে বাড়ির সামনের ছোট্ট বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসেছিল লাবণ্য। শীত গিয়ে বসন্তের হাওয়া দিতে শুরু করেছে। পিঙ্কিদের পেয়ারা গাছে বসে তারস্বরে কোকিলটা টানা ডেকে চলেছে। ওই যে এবার কোথা থেকে তার সঙ্গিনীও যোগ দিয়েছে। ভারি মজার ! এ যেন ওপেন এয়ার কনসার্টে দুই ওস্তাদের যুগলবন্দী। বসন্তের সাথে বিশেষ টান অনুভব করেনা লাবণ্য। ভুলেও গেছে যদিবা জীবনে কিছু স্বপ্নদেখা অথবা স্বপ্নপূরণের বসন্ত এসেছিল। হয়তো কখনও শিউরে উঠত ফালগুনী পূর্ণিমার বকুল গন্ধে। মন উতলা হত কোনও 'চির অচেনা পরদেশীর' জন্য। আজ আর মনে পড়েনা এতটুকু।

তরতরিয়ে বেড়ে ওঠা বোগেনভেলিয়াটাকে কাজের মেয়ে চম্পাকে বলে বারান্দার বাইরের শেড বরাবর বাঁধিয়ে নিয়েছিল। এই প্রথম বসন্তেই কচি বেগনেরঙা ফুল আর কচি সবুজ পাতায় ভরে উঠেছে গাছটা। হালকা দোল খাচ্ছে হাওয়ায়, বিকেলের লালচে সোনালী আলো মেখে। খুব ইচ্ছে করছে আর একটা কাপ চা নিয়ে বসতে। স্কুলে থাকলে প্রতি গ্যাপে একটা করে চা নেওয়া ওর অভ্যেস। বাড়িতে তাই কমই খায়। এখন ইচ্ছে করছে খুব। কিন্তু শরীরটা ইদানীং দুর্বল লাগে। দুর্বলতাটা বাড়ছেই ক্রমশঃ, বল নেই যেন উঠে গিয়ে এক কাপ চা বানায়। অথচ এই তো মাত্র তিনমাস আগে সুজয়া বর নিয়ে এল, সাথে মীরাদি এল, ছেলে-ছেলের বউ সমেত পুরো পরিবার, এতগুলো লোকের রান্না নিজে হাতে করেনি কি ? অভ্যেস তো নেই বেশী কাজ কর্ম করার। সংসার ধর্ম করল আর কোথায় সে! কিন্তু সবাই ডাকে যখন পালটা কিছু সামাজিক দায়িত্ব তো থেকে যায়। তখন এমন ক্লান্তি ঘিরে ধরেনি তো! কিন্তু আজকাল মনে হয় প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে আরও আরও ফুরিয়ে যাচ্ছে যেন। হাত দুখানা চোখে পড়ার মত শীর্ণ দেখায়। দু চোখের কোলে কে যেন কালি লেপে দিয়ে চলে গেছে। রূপ নিয়ে তার কোনও আক্ষেপ নেই কিন্তু কোনও কঠিন অসুখ বেঁধে বসল নাকি ? তার ভার নেবার কেউ যে নেই ! চিন্তাটা আসতেই কিছুক্ষণ আগের ভাললাগাটা উবে গিয়ে একটু শীত বোধ হচ্ছে যেনবা!

কি আর পিছুটান তার ! যদি চলে যেতে হয় যাবে। কারো জীবন তো তার জন্যে ভেসে যাবেনা। ওই ছাত্রীগুলো আর সুজয়া, মীরাদিরা কাঁদবে একটু। ভাগ্যিশ ! তবু কেউ ত কাঁদার জন্যে আছে লাবণ্যর, এতোটাও ব্যর্থ নয় তার জীবন। আর রূপক, কি যে করে ছেলেটা! জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাল একগাদা টেস্ট করাল। কি দরকার ছিল এতগুল টাকা খরচ করানোর।

শরীর নিয়ে চিন্তা লাবণ্যকে আজকাল ডিপ্রেসড করে দিচ্ছে। যার জীবনটা কেবল আঘাত আর লড়াই, তার চূড়ান্ত নির্লিপ্তি ভেদ করে নতুন ডিপ্রেশন কোথা থেকে জায়গা নেবে? কিন্তু নিল তো! তাহলে লাবন্যও নিজেকে ভালবাসে। জীবন ওকে নির্লিপ্তি এনে দিলেও কাঠিন্য এনে দেয়নি। ওর মমতা ভালবাসার জায়গাগুলো রসসিক্ত করে রেখেছে ওর ছাত্রীরাই। গোটা স্কুল জানে এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস লাবণ্য মিস কড়া, ঋজু, ব্যক্তিত্বময়ী কিন্তু মন ওঁর টলটলে ভালোবাসায় পূর্ণ।

নাঃ, তাকে বাঁচতে হবে। শুধু নিজের জন্যেও বাঁচতে হবে। সে তো আর শোকের কাছে নিজের দাসখৎ লিখে এতগুল বছরকে ব্যর্থ করে দেয়নি। নানা দায়িত্ব-কর্তব্যের বাঁধনে নিজেকে সততার সাথে বেঁধেছে। ওই ছেলেমানুষ রূপক কোথাথেকে এসে তাকে অপূর্ব স্নেহ দিয়ে যে আত্মীয়তার স্বাদ এনে দিয়েছে লাবণ্যর জীবনে, সেই আস্বাদ তো জীর্ণ পুরানো পোশাকের মত রান্নাঘরের ন্যাতা হবার জন্যে দড়িতে ঝুলে ছিল কতকাল। আজ এত সহজে চলে যাবার

কথা মেনে নেবেনা লাবণ্য। যদি আরও বড় কোনও লড়াই ঘাপটি মেরে এসে দাঁড়িয়েছে, ওকে তার মোকাবিলা করতেই হবে। একটা শখ, মাত্র একটাই- যদি একবার অন্তত তাকে দেখা যেত! ঈশ্বর বিশ্বাস তার কবেই উবে গেছে। তবু মনে মনে তার ভাগ্যের কাছে এই একটাই প্রার্থনা সে নিজের জন্যে করে যদি একটাবার তাকে দেখা যায়!

(৩)

রূপক গতকাল তার লাবন্যদিদির রিপোর্ট গুলো কালেক্ট করেছে। কিন্তু আজ আর ভয়ে যেতে পারেনি দিদির কাছে। কিকরে বলবে তাকে এই ভয়ানক কথা? আল্ট্রা সাউন্ডে লোয়ার এবডোমেইনে যে টিউমারটা মারাত্মক ভাবে ব্লীড করে চলেছে, যার জন্যে দিদির হিমোগ্লোবিন অসম্ভব ডাউন সেটা ম্যালিগ্ন্যান্ট হবার বিরাট সম্ভবনা সেকথা ওই রিপোর্ট পেয়ে ডাক্তারের কাছে জেনেও এসেছে। এবার এম আর স্ক্যান আরো কিছু ব্লাড টেস্ট ইত্যাদি করতে হবে বলা হয়েছে। তারপর অপারেশন বা ফারদার ট্রিট্মেন্ট হবে কিনা সেসব ভাবনা।

রূপক এসব কথা মরে গেলেও জানাতে পারবেনা দিদিকে। এই সেদিন কত বকাবকি করল রূপককে খামোখা এত সব টেস্ট করাচ্ছে বলে। এই বয়সে গ্যাস অম্বল একটু আধটু উইকনেস এসবই স্বাভাবিক। তার মনের কোথাও এই ধারণাটুকু নেই যে তার শরীরে এমন এক মারণ রোগ বাসা বেঁধে থাকতে পারে। লাবন্য দিদির মত একজন মানুষ এমন একটা একলা জীবন কাটাল কোন বিড়ম্বনায় সে কাহিনি শোনানোর মত বিশ্বাসযোগ্যতা সে এতদিনে অর্জন করেছে। আর সেই থেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে লাবণ্য দিদির জীবনের একমাত্র আশা-স্বপ্ন-সাধ সে পূরণ করবেই। যেভাবেই হোক নিজে দায়িত্ব নিয়ে কিছু অন্তত ফিরিয়ে দেবে তার এই শেষ বিকেলে পাওয়া সব হারানো দিদিটাকে।

ট্রিনার নাম্বার যোগার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি রূপককে। নাম এবং ঠিকানা জানার পর খুব সহজেই ফেস বুক সার্চে ট্রিনা জন্সনের প্রোফাইল ভেসে উঠেছে। প্রোফাইলে সব ইনফর্মেশন লকড, কিন্তু প্রোফাইল ছবিটা অনেক কিছু বলে দিয়েছে রূপককে।

সে অপেক্ষায় আছে যে কোনও মুহূর্তে ওর মোবাইলে কল আসবে। বেশ টেনশন হচ্ছে রূপকের। কিভাবে নেবে মেয়েটা, সে পারবে কিনা ওকে কনভিন্স করতে সবচে বড় কথা সময় কতটা দেবে, সব গুছিয়ে বলার জন্যে। এইসব নানাবিধ ভাবনা। প্রতিটা কলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ফোন তুলছে রূপক আর বার বার হতাশ হচ্ছে। সন্ধ্যে পেরিয়ে, রাত ঢলে গেছে যখন মধ্যরাত্রির সীমা পার করে, রূপক কিছু ডকুমেন্ট সর্ট করছিল, সাইলেন্সে রাখা ফোনটা কেঁপে উঠল আর স্ক্রীনের আলো

জ্বলে উঠল। ঝাঁপ দিয়ে ফোন তুলে নিল রূপক। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। নানান টিউনে আস্তে জোরে সে 'হেলো, হেল্লো, হ্যালোউ .....' করে গেল কিন্তু কেটে গেল লাইন। মনে মনে হিসেব করতে লাগল ইংল্যান্ডে এখন দিন না রাত। উত্তেজনায় সে ভুলে গেল সারে পাঁচ ঘন্টা এগিয়ে না পিছিয়ে আই এস টির থেকে। সাহস করে নিজে কল না করে ট্রিনার কলের জন্য শবরীর প্রতিক্ষায় রইল।

মিনিট দশেক পরে ল্যাপটপ থেকে একটা মজাদার মিউজিক ভেসে এল, ছুট্টে গিয়ে স্কাইপ কলটা রিসিভ করল রূপক। ইয়েস ..... এসেছে, সে এসেছে। কথা বুঝতে না পারলে টাইপ করা যাবে ..... – হ্যালো মিস্টার ..... – রূপক সাহা। গভমেন্ট স্কুল টিচার ..... – হাই মিঃ সাহা আমার আজ লং ওয়ারকিং ডে গেছে। খুব টায়ার্ড, আমাকে আর্লি বেডে যেতে হবে। আমি তোমাকে বলার জন্যে পাঁচ মিনিট দিলাম।

– হ্যাঁ হ্যাঁ ..... বলছি (ঢোঁক গিলে বলে)

– ক্যারি অন ..... (এইটুকু বয়েসের মেয়ে এমন আপার হ্যান্ড নিয়ে কথা বলছে যে রূপক হারিয়ে ফেলছে নিজেকে। তার ওপর মেয়েটির অদ্ভুত এক্সেন্টে ইংলিশ বলা। প্রতি শব্দের অর্ধেকের বেশী অংশই গিলে নিচ্ছে।)

– তুমি জানোকি যে তুমি এডপ্টেড চাইল্ড ? তোমাকে ইন্ডিয়ার একটা হোম থেকে এডপ্ট করেছিলেন তোমার পালক বাবা-মা মিঃ এন্ড মিসেস জনসন। তোমার জন্ম নাম তৃণা সেন। (বাঁকানো বাঁশের ছিলকা যেভাবে তীর গতিতে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ঠিক তেমন করে সোজা হয়ে বসল ট্রিনা। এই তো ম্যাজিক কাজ করেছে কোথায় যাবে প্রাণের টান রক্তের টান, কয়েক সেকেন্ড নীরবতা তারপর খুব শান্ত ধীর গলায় কাটা কাটা উচ্চারণে ট্রিনা বলল)

– তুমি কি আমাকে আমার জন্ম বৃত্তান্ত শোনাবে ?

– হ্যাঁ, আমি তোমাকে শোনাব। তোমার বায়োলজিকাল মায়ের খুব বিপদ, তিনি খুব একা। আমি তোমাকে তাঁর কথা শোনাব। কিন্তু পাঁচ মিনিটে তো হবেনা, আমাকে আরও সময় দাও। (ট্রিনার মুখ দেখে মনে হলনা সে আর বাধা দিচ্ছে। উৎসাহ যে দেখাচ্ছে এমন ও না। যেন কোথায় হারিয়ে গেছে ওর মন, কেবল দেহটা কম্পিউটার স্ক্রীনের সামনে নিশ্চল বসে আছে।)

– কিন্তু আমি কিকরে বুঝব তোমার সব তথ্য সত্য ? প্রমাণ আছে ?

– সব আছে ট্রিনা। তোমাকে ১৯৯৫ এ এ্যডপ্ট করা হয় মাদার টেরেজার হোম থেকে। দিনটা ছিল ২৩ শে জুন। তোমার জন্মের ঠিক তিন মাস চারদিন পরে। তোমার এ্যডপশন রেফারেন্স নাম্বার ..... – তোমার ডান কানের ওপর দিকে সাইনাসের একটা ছোট্ট হোল আছে, যেটা তোমার বার্থমার্ক। ঠিক বলছি ?

– ইয়া। আমার পাস্ট লাইফের কথা তুমি কি জান ?

– তোমার ফ্যামিলি বলতে তোমার বায়োলজিকাল মাদার ছাড়া আর কেউ নেই। তোমার বাবা ছিলেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইকোনমিক্স এর অধ্যাপক। তোমার মা তাঁর ছাত্রী ছিলেন। বিবাহিত এবং দুই সন্তানের বাবা হওয়া সত্ত্বেও তোমার মায়ের সাথে ওঁর সম্পর্ক হয়। তোমার মা সত্যিই ভালবেসেছিলেন তোমার বাবাকে কোনও রকম সামাজিক স্বীকৃতির দাবী ছাড়াই। কিন্তু তুমি যখন ওঁর গর্ভে এলে, তোমার মা চেয়েছিলেন তোমার বাবা তোমার পিতৃত্ব স্বীকার করুন এবং তোমার দায়িত্ব গ্রহন করুন। স্ত্রী সন্তান এবং সমাজের কাছে, আমাদের কালচার অনুযায়ী তোমার বাবার এই অপরাধ বড়ই নিন্দার এবং সমাজচ্যুত হবার সম্ভাবনা। তাই তোমার বাবা চাইলেন তুমি এই পৃথিবীতেই না আস। কিন্তু তোমার মা তোমাকে গর্ভেই মেরে ফেলতে পারেননি। তিনি নিজের গোটা পরিবার এবং সমাজের বিরূদ্ধে গিয়ে কারশিয়াং এ এক বন্ধুর বাড়িতে কিছু মাস কাটিয়ে তোমার জন্ম দিলেন। তোমার মায়ের পরিবার ওঁর সাথে সব সম্পর্ক ত্যাগ করল। যখন তোমার সবে একমাস বয়স, তোমার মা তোমাকে নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতা শহরতলীতে একটা ছোট্ট বাসা ভাড়া করে। কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান সমাজে এমন ঘটনা ভয়ানক পাপ। একে প্রশ্রয় দেওয়াও বিরাট অপরাধ। তাই তোমার মা তোমায় নিয়ে ভয়ানক বিপত্তির মুখে পড়লেন। কোনো সাহায্য পেলেন না। তিনি জায়গা বদল করলেন তোমায় নিয়ে, কিন্তু সেখানে পরিস্থিতি আরও খারাপ হল। একটা চাকরি অব্দি পেলেন না, অবিবাহিত মাতৃত্বের অপরাধে।

– আমি ধরতে পারলামনা এতে ভুল কি আছে ? সোসাইটি রেগে কেন গেল মহিলার ওপরে, আফটার অল একজন এডাল্টের বাচ্চা জন্ম দেওয়াটা তার ডেমক্র্যাটিক রাইট।

– এই দেশটা ভারতবর্ষ। পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম। বহুবছর নানা সংস্কারে আচ্ছন্ন একটা জাতি আজও সেসব ছাপিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারেনি।

– রাইট। কিন্তু আমি কি করতে পারি ? (এই প্রশ্নে থতমত খেয়ে যায় রূপক। মেয়ে তার নিজের মায়ের পরিচয় পাচ্ছে অথচ তার চিত্তে কোনও হেল দোল নেই, বঙ্গ ললনার রক্ত তো এমন হবার কথা ছিলনা। এই নির্লিপ্তি রূপকের এতক্ষণ ধরে রাখা যোশের বেলুনে একটা হালকা পিন ফুটিয়ে দিল।)

– ব ব্বাট তোমার মা এখন মৃত্যুশয্যায়, ক্যান্সারের সাথে লড়াই করছে। তোমায় দেখতে চায় ..... একবার, প্লীজ

একটাবার নিজের মাকে চোখের দেখা দেখার সুযোগ নিতে চাইবেনা তুমি? [শেষ মরিয়া চেষ্টা হিসেবে বেশ কিছুটা মিথ্যে বলে ফেলল রূপক]

– তোমার সাথে আমার কোনো ব্লাড রিলেশন আছে ?

– না নেই, আমি তোমার মাকে নিজের বড় বোন বলে মানি, তোমাকে একবার দেখার ইচ্ছের কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন উনি

– তুমি ওই মহিলার ঠিকানা দিয়ে রাখ, আমার মনে হয়না আমি এসবে নিজেকে ইনভল্ভ করব। (বার বার 'ওই মহিলা' – 'দ্যাট লেডি' শব্দদুটো খুব পীড়া দিচ্ছিল রূপককে। কে জানে কোন পরিবেশে কিভাবে বড় হয়েছে এই মেয়ে। মনে আদতে মায়া মমতার বাস আছে কিনা। লাবণ্য দিদি এই মেয়েকে দেখে দুঃখই পেত। যাক, সে তো চেষ্টা করেছিল নাহয় ব্যর্থই হল।)

– যথেষ্ট দেরী হয়েছে। আমি শুতে যাব। তুমি আমাকে আর ডিস্টার্ব করবেনা। আই ওয়ান্ট টু স্টে আউট অফ ইট। ব্যাস, 'ট্রিনা ডট জন্সন ৯৫' অফলাইন হয়ে গেল। স্কাইপ প্রোফাইল ছবিটার দিকে চেয়ে লজ্জা করল রূপকের। চোখা চোয়াল, দুটো ঠোঁট চুমু খাবার মত করে তুলে ধরা, দুই চোখ যেন কামে জরজর অর্ধ নিমীলিত, পরনের জামাটার ভেতর থেকে বহুদূর অবদি বুকের চড়াই উতরাই প্রকাশিত। চোখ সরিয়ে স্কাইপের জানলা বন্ধ করল রূপক। সবটুকু এড্রিনালীন ঝুপ করে পড়ে গেল তার। নাঃ, কিচ্ছু হল না। তীরে এসে তরী ডুবে গেল।

(৪)

পল আর নিকোলা জনসন সচ্ছল, নিরীহ, ভদ্র ও যথেষ্ট সেন্সিবল বাবা মা। ফ্রাইডে নাইটে রাত আটটায় মেয়েকে বেডে যেতে দেখে উদবিগ্ন হল পল।

– নিকোলা, ট্রিনা কি সুস্থ ? আর্লি বেডে যাচ্ছে কেন! নিকোলা নক করে ট্রিনার দরজা।

– হানি, তুমি কি ঠিক আছ ? এত তাড়াতাড়ি বেডে গেছ, তোমার কি আমাদের দরকার ? তাহলে আমরা আজ রাতে ঘরে থাকব।

শুক্রবারের রাত থেকে সব বয়েসের মানুষ উইক এন্ডের সামাজিকতা, আড্ডা ফুর্তি শুরু করে দেয়। নাইট ক্লাব, বার বা পাব ক্রলিং এ উদ্দাম হতে থাকে রাতের আনন্দ। যতদিন শরীর বইতে পারে এরা চুটিয়ে উপভোগ করে জীবনকে। ট্রিনার মম ড্যাড এখনও বেশ শক্ত সমর্থ।

– ট্রিনা, ভেতরে আসতে অনুমতি দেবে? পল নরম করে বলে।

– অমি লং আওয়ার্স প্রজেক্টের কাজ করে খুব টাইয়ার্ড, ড্যাড। ঘুমোতে চেষ্টা করছি। তোমরা যেতে পার নাইট আউটে। আমি ঠিক আছি।

– তুমি সিওর হানি? আমরা কিছু মাইন্ড করবনা না যেতে পারলে। নিকোলা বলে, একবার ভেতরে আসার অনুমতি দাও, তোমাকে ভাল শোনাচ্ছে না ডিয়ার।

– প্লীজ ভেতরে এস, তোমরা অকারণ চিন্তা কর। আমি একজন এডাল্ট। আমার বন্ধুরা সব ইউনি হস্টেলে থাকে। আমি একদম ঠিক আছি।

– না তেমন শোনাচ্ছে না। তুমি লং আওয়ার্স কাজ করে বাড়ি এসে একটা পট ইয়োগার্ট খেয়েছ মাত্র। তুমি ঠিক আছ বলছ, কিন্তু তোমার এ্যাপেটাইট নেই

– তোমরা এবার ইন্টারোগেট করছ। বলে একটু হাসার চেষ্টা করল।

– আমরা জানি তোমার লাইফ তোমার নিজস্ব, কিন্তু যদি তোমার সমস্যা ভাগ করে নাও, আমরা হয়তো সাহায্য করতে পারি!

– ওয়েল, আমি ইনডিসিশনে আছি।

– কি বিষয়ে ? তোমার বয়ফ্রেন্ড এর সাথে .....

– না, এমন কিছু ঘটেছে আমার সাথে যা তোমরা কেউ ভাবতেও পারবেনা।

– বল বেবি, আমরা এ্যংশিয়াস।

– আমার বায়োলজিকাল মম যোগাযোগ করেছিল .....

– হোয়াট ? (দুজনে একসাথে, পল যেন কাঁপতে লাগল, নিকোলা পলের কাঁধে হাত রাখল শক্ত করে)

– আই মীন এমন কেউ করেছিল যে ঐ মহিলাকে চেনে।

– মাই গড! কোথায় পেল তোমার খবর ?

– হোম থেকে আমার এ্যডপশন ডিটেইল নিয়ে বাকিটা নেট থেকে

– কি চায় এখন? দিস ইজ কমপ্লিটলি আনএথিকাল। হোম তোমার এক্স ফ্যামিলির সাথে ডকুমেন্ট শেয়ার করতে পারে না। আমি এখনই ফোন করব। পল উত্তেজিত হয়।

– এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিও না। আগে শোনা হোক সবটা। নিকোলা বলে।

– তারপর কি হল ডিয়ার? পল উতকণ্ঠিত স্বরে বলে।

– দ্যাট লেডি ইস ডাইং। আমাকে দেখতে চায় একবার। (পল আর নিকোলা চোখাচোখি করে)

– তুমি কি ভাবলে? উত্তেজনায় নিকোলা ততোধিক স্থির হয়ে যায়।

– আমি আনডিসাইডেড। ট্রিনা বলে।

পল ট্রিনার হাত চোপে ধরে, নিকোলা ওর কাঁধে আলতো চাপ দেয়। পলের হাতেও তখন কম্পন। উদ্গ্রীব হয়ে আছে মেয়ের উত্তর শুনতে। এ কি ঝড় নেমে এল ওদের শান্ত নিশ্চিন্ত জীবনে !

– তুমি যাও ইন্ডিয়া। নিকোলা বলল।

– আর ইও ক্রেজি নিকোলা? পল চিৎকার করে উঠে বেডসাইড টেবিল থেকে ট্রিনার টেবিল ক্লকটা আঁছড়ে ফেলে মাটিতে। ওটা টুকরো হয়ে দোল খায় আর যেন তামাশার চোখে চেয়ে থাকে সদ্য হেরে যেতে বসা বাবার প্রতি।

– না মম!! কেন একথা বলছ?

– বলছি কারণ তুমি ইনডিসিশিনে ভুগছ। যদি তোমার রিপার্কাশন না হত তুমি স্ট্রেট 'যাবেনা' ডিসাইড করতে। তুমি ২১ প্লাস। তুমি জান কোনটা রাইট কোনটা রং। এখানে আমরা ইন্টারফেয়ার করতে পারিনা। সম্পূর্ণ তোমার একার সিদ্ধান্ত। নিকোলা বলে খুব স্বাভাবিক স্বরে। – কিন্তু ব্যাপারটা এত ইজি হতে পারেনা। সি, এইটুকু কথায় আমার বেবি কতটা ডিস্টার্বড। তুমি ভাবতে পার কতখানি কমপ্লিকেশনের মধ্যে তুমি ওকে ঠেলে দিচ্ছ ? না হানি, তুমি কোথাও যাচ্ছনা। আমার মত নেই। পল ততটাই অধীর। নিকোলা বলল,

– গুড নাইট ডিয়ার। তোমার সিদ্ধান্ত জানিও। পরদিন ট্রিনার লন্ডন হিথ্রো টু কলকাতার টু এন্ড ফ্রো টিকিট কাটা হয়ে গেল, পনের দিনের স্টে।

ভিসা হাতে এসে গেল দিন সাতেকের মধ্যে। আরও তিনদিন পর যাত্রা। সবটা করে নিয়ে রূপককে ফোন করে সারপ্রাইজটা দিয়েছিল ট্রিনা।

(৫)

– তুমি চল এয়ারপোর্টে আমার সাথে। মেয়েকে দেখলে দেখবে সব শরীর খারাপ ঠিক হয়ে যাবে।

– না না রূপক, আমি কিভাবে যাব। আমার সাথে ওর সম্পর্কই বা কি ?

আমার খুব ভয় করছে। কি পাগলামি যে তুমি করলে। আমি বললাম আর তুমি ওই মেয়েকে টেনে নিয়ে এলে? আমার ভীষণ ভয় করছে। আর দেখ এখন শরীরটা কেমন রোগা হয়ে গেছে। লজ্জা করেনা বল ?

– দিদি, তুমি আমাকে হাসালে, মেয়ের কাছে মায়ের আবার লজ্জা।

– আমাকে ও মা বলে মানে নাকি .....

– আমিও তা ভেবেছিলাম দিদি, কিন্তু যেভাবে দশদিনের মধ্যে ছুটে আসছে আমার বিশ্বাস একেবারে পাকা গো দিদি। রক্ত কথা বলে। একবার মাত্র শুনে কিভাবে ছুটে আসছে তুমি দেখছনা ?

সকাল সাতটা পঞ্চান্ন কলকাতার মাটি ছুঁল প্লেন লাবণ্যর তৃণাকে নিয়ে। জন্সন পরিবার ওর মাতৃদত্ত নামটি বদল করেনি। নামটির অর্থ যখন জেনেছে মিসেস জনসন মখমলী সবুজ নরম মেয়েকে কোলে নিয়ে, তখন খুব মনে ধরেছিল তার। কেবল পদবী বদলে গেছিল।

হাতে ট্রিনা জন্সন লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করছিল রূপকের। কিন্তু নিরূপায়। সামান্য একটা ট্রলি নিয়ে ছিপছিপে লম্বা কালো একমাথা ঝাঁকড়া চুলের দিঘল কালো দু চোখের যে মেয়েটি এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করল তাকে বাঙালি বলে মনে করা কঠিন। বরং ব্রাজিলিয়ান বা নর্থ এমেরিকান ভাবা যেতে পারে অনায়াসে।

– হাই

– তুমি রূপক?

– হ্যাঁ।

– আমি কি এয়ারপোর্টের কাছাকাছি হোটেলে থাকব নাকি শহরের ভেতরে থাকলে সুবিধে হবে ?

আবার থতমত খেল রূপক। মায়ের কাছে এসেছে, হোটেলে থাকবে আবার কি কথা ? নাঃ ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে অচেনা প্রমাণ করে এই মেয়ে !

– তুমি যদি তোমার মায়ের বাড়িতে থাক, খুব আসুবিধে হবে ?

– না, তা হয় না। [কাটা কাটা স্পষ্ট উত্তর এল এবার, মেয়েটিকে যতটা মনে হয়েছিল তার চেয়েও দুর্ভেদ্য মনে হল রূপকের]

– আসলে তুমি আসবে বলে দিদির বাড়িকে তোমার থাকার উপযুক্ত করার ব্যবস্থা করেছি আমরা। তোমার অসুবিধা হবেনা।

সুজয়ার বড়-জা' জার্মান লেডি। সুজয়ার শশুরবাড়িতে সেই জা-ভাসুর ছেলে মেয়ে নিয়ে আসার আগে তার জন্যে শুকনো টয়লেট, টয়লেট ফ্লোরে ম্যাট এবং কোমোডের পাশে টয়লেট ট্যিসুর রোল রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সুজয়ার পরামর্শেই ট্রিনার জন্যে ঝটিতি সব যোগাড় করে ফেলেছে রূপক। আর এখন এই মেয়ে বলে কিনা হোটেলে থাকবে!

– আমাকে আগে স্নান করে ফ্রেশ হতে হবে। আমি হোটেলে চেক ইন করব, তারপর ডিসাইড করা যাবে। তুমি একটা হোটেলের ব্যবস্থা করে দাও। রূপকের এব্যাপারে জ্ঞানের বড়ই অভাব। শহরের বড় বড় ফাইভ স্টারের নাম যদিও তার জানা কিন্তু এই মেয়ের কি বাজেট, আর ওইসব হোটেলের খাঁই

কিরকম সেসব ওর অজানা। এয়ারপোর্ট হোটেল সামনেই দেখতে পেয়ে ট্রিনাকে ওখানে ড্রপ করল রূপক। বলল,

– তুমি ফ্রেশ হয়ে একটু রেস্ট করে নাও। লাঞ্চের আগে এসে নিয়ে যাব। বেশ কিছুটা ঘুমিয়ে পড়েছিল ট্রিনা। তিনটের দিকে রূপকের ফোন আসে ওর রুমের টেলিফোনে।

– তুমি ঠিক আছ?

– ও! সরি, আমার মনে হয় জেট ল্যাগ হচ্ছে। পনেরো মিনিটে নীচে আসছি।

– আমার যেতে আধ ঘন্টা লাগবে। টেক ইওর টাইম।

কলকাতার গরম, উত্তাল জন সমুদ্র, ট্রাফিক আর অনবরত কোলাহলের এক ভয়ঙ্কর গর্জন তৃণাকে একেবারে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। গোবেচারা আনইম্প্রেসিভ চেহারার বিদেশে একমাত্র পরিচিত মানুষটিকে মোটের ওপর নিরাপদ মনে হল ট্রিনার। উবারের পেছনের সীটে মাথা এলিয়ে সে ঠিক কি যে ভাবছিল তার হদিশ রূপক এতটুকু পাচ্ছিল না। ও কি এখন নিজের জন্মদাত্রীকে দেখবে বলে ভেতরে ভেতরে প্রবল উত্তেজিত? তাই কি এমন স্তব্ধ হয়ে আছে? এমন নাটকীয় মুহূর্ত ক'জন মানুষের জীবনে আসে! বিকেল পাঁচটা দশে তৃনাকে নিয়ে লাবন্যর বাড়ি পৌঁছল রূপক। আর কার কি হচ্ছে তার জানা নেই কিন্তু নিজের এই এ্যাচিভমেন্টে রূপকের চোখের জল আর বাঁধ মানছিলনা।

– ইনি তোমার মা হন, তৃণা। দিদি এই যে দেখ কাকে নিয়ে এসেছি, তোমার .....

[বাক্যটা সম্পূর্ণ হতে পারলনা। মা ও মেয়ের প্রথম দর্শনের নির্লিপ্ত নিঃস্পৃহতার কাছে তার আবেগ বাক্যহীন হয়ে পড়ল।গ্রীলের গেট খুলে দাঁড়িয়ে মেয়েকে দেখল লাবণ্য। তৃণা মাকে পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে এল।

লাবণ্য চেয়েছিল মেয়ের দিকে কিন্তু ভীষণ বোবা সেই চাউনি, কোনো ভাষা নেই। আর তৃণা যেন দেখেও দেখেনি লাবণ্যর অস্তিত্ব]

– এখানে বসতে বল ওকে। [লাবণ্য ইশারায় বেতের সোফা দেখাল রূপকের দিকে ফিরে, তৃণা বসল একবারও মায়ের চোখের দিকে না চেয়ে। – ও চা খেলে চম্পাকে বানাতে বলব। জিগ্যেস কর ওকে রূপক, [লাবণ্য কথা ক'টি বলল রূপকের দিকে চেয়ে। রূপক জিগ্যেস করল এবং জড়সর হয়ে বসে থাকা তৃণার কাছ থেকে ছোট্ট সংক্ষিপ্ত উত্তর এল]

– না। [এই ঘর, ঘরে বসে থাকা নারী পুরুষ, বাইরের বেরং পৃথিবী – তৃণা এর মাঝে কোথাও নিজেকে মেলাতে পারছিল না। কেবল স্থির থাকার চেষ্টা করছিল প্রাণপণ।]

– দিদি, এই তোমার মেয়ে, এই তোমার সেই ছোট্ট তৃণা। কথা বল। ইংলিশ বল, ও ঠিক বুঝে নেবে ..... [বাংলায় বলল রূপক, ইতিমধ্যে চম্পা ভেতর থেকে ট্রে তে করে সবার জন্যে চা আর এক প্লেট বিস্কুট আর শিঙাড়া এনে সামনের টেবলে রাখল]

– ও চা খায় তো? প্রশ্নটা রূপকের দিকে চেয়ে করল লাবণ্য।

– তুমি কি চা খাও তোমার মা জানতে চাইছেন, [রূপক তর্জমা করে তৃনাকে জিগ্যেস করল।

– না খাইনা। আমি যাব। হতচিকিত হয়ে রূপক ইংরিজীতে বলে, – মানে? কেন? তুমি বস প্লীজ, আমি চলে যাচ্ছি তোমরা কথা বল ..... দিদি

তুমি ওর সাথে কথা বল প্লীজ। তুমি ইংলিশে বল, ও ঠিক বুঝবে। শেষ বাক্য বাংলায় লাবণ্যর উদ্যেশ্যে বলে উঠে পড়ে রূপক।

হঠাৎ ট্রিনা উঠে দাঁড়াল। এবং রূপককে বলল, – আমাকে যেতে হবে। এখুনি। তুমি আমার ট্যাক্সি ডেকে দাও।

– ও চলে যাচ্ছে ? আমার যে কথা আছে। লাবণ্য মরিয়া বলে উঠল।

'দিস ইজ নট মাই প্লেস! দিস ইজ নট মাই প্লেস' বলতে বলতে ট্রিনা বেরিয়ে এল একবারও মায়ের দিকে না ফিরে চেয়ে।

ঘটনার আকস্মিকতার ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই কিছু না ভেবে ট্রিনার পেছনে ছুট দিল রূপক।

– সরি ট্রিনা, আমরা কিছু ভুল করেছি? আই মিন আমরা ঠিক বুঝতে পারছিনা কোন ঘটনা তোমাকে বিরক্ত করল ... তুমি এসেছ তোমার মাকে দেখতে .....

– তুমি কি ট্যাক্সি ডাকবে আমার জন্যে? আমি জানিনা আমি এখানে কি করছি! .....

– ডাকছি ..... [অনলাইন ট্যাক্সি ডেকে নিল রূপক] দশ মিনিট লাগবে। [দশ মিনিটে একটা শব্দও উচ্চারন করেনি ট্রিনা। মুখে একটা বিরক্তির আস্তরন ছেয়ে ছিল শুধু]

লাবণ্য স্তব্ধ বসে ছিল বসার ঘরের বেতের সোফায় ..... মন ছুটে এসেছিল তার নিজের ঔরসজাত কন্যার পিছু পিছু। কিন্তু ভাল করে একবার চেয়ে দেখতে পর্যন্ত পারেনি এই পৃথিবীতে একমাত্র যে তার রক্তের সাক্ষ্য বহন করছে তার দিকে। সারা দুনিয়ার সবটুকু স্থবিরতা তাকে গ্রাস করেছিল। সমস্ত স্বত্ত্বা তার এই পরিণত বয়সের হ্যাংলামির দিকে ভেংচি কেটে বলেছিল – এর সাথে তোমার কোনও বন্ধন নেই, কোনও দাবী নেই। অনেকদিন আগে এই দাবী তুমি ছিন্ন করেছ। ওর রক্তস্রোতে কোথাও কিছু বাকী নেই তোমার জন্য। ট্যাক্সিতে উঠেই ট্রিনা পলকে ফোন করল।

– তুমি ফোন করছনা, আমরা কত চিন্তা করছি!

– ড্যাড, তুমি ঠিক বলেছিলে, আমার আসা উচিত হয়নি। ইন্ডিয়া ইজ বুলশীট। ভেরি ডার্টি, ফুল অফ বেগারস ..... আর তুমি যেখান থেকে আমাকে তুলে নিয়েছিলে, আমি এমন একটা পরিবেশ চিন্তা করতে পারিনা। মমকে বল আমি ভুলে যেতে চাই আমার পাস্ট। আমি কোথাও নিজেকে কানেক্ট করতে পারিনি। আমি শুধু তোমাদের মেয়ে ..... আমার আর কোনও পাস্ট নেই ..... চোখ থেকে ফোটা ফোটা জল গড়িয়ে তৃণার টপ ভিজে যেতে থাকল ..... – ইউ আর রাইট বেবি। তুমি আমাদের মেয়ে, দিস ইজ দ্য অনলি ট্রুথ। তুমি ফিরে এস হানি। – তুমি আমার টিকিট এগিয়ে দাও। এ্যাজ আরলি এ্যাজ পসিবল

– সিওর হানি ..... তুমি কি ওই লেডিকে মিট করেছ? ও কি তোমায় ফোর্স করেছে? তাই কি তুমি এত ডিস্টার্বড হয়ে আছ ? – ওর সাথে আমার কোনও কথা হয়নি। খুব অবাক লাগছে এই মহিলা আমার জন্ম দিতে পারে ভেবে। আমাদের দুজনের কারো প্রতি কোনও কানেকশন হয়নি। ওর বাড়ী, ওর চেহারা, গলার আওয়াজ সব কিছু ভীষণ মরবিড সাউন্ড করেছে আমার কাছে। আমি বেরিয়ে চলে এসেছি। আমার এখানে আসা উচিত হয়নি। আয়াম শকড।

– বি স্ট্রং ডিয়ার। কিছুই হয়নি। লাইফে এমন কিছু রিয়েলিটির সামনে আমাদের দাঁড়াতে হয়, শুধু মনে রাখ আমরা আছি তোমার সাথে। তোমার সব সিচুয়াশনে আমরা আছি। তোমাকে একটা ভাল আইডিয়া দেব?

– তুমি কেন ১৫ ডেজ এর একটা ট্যুর বুক করে ইণ্ডিয়া দেখে নিচ্ছ না? উই ক্যান ওয়ার্ক ইট আউট। থমাস কুক বা ভাল কোনো ট্র্যাভেল এজেন্সির সাথে একটা প্যাকেজ বুক করে নাও। এই অপরচুনিটি লুজ কোর না। তুমি কলকাতার বাইরে গেলে দেখবে ইন্ডিয়া ইজ রিয়েলি বিউটিফুল! বহু টুরিস্ট সারা দুনিয়া থেকে ইন্ডিয়া দেখতে যায়। হাউ ইট সাউন্ডস হানি?

– আই এয়াম টাইয়ারড, আই জাস্ট হাভ টু গো ব্যাক। প্লীজ আমার টিকিট চেঞ্জ কর।

– ওকে ওকে। তুমি ফিরে এস। আমি করে দিচ্ছি টিকিট, জানাচ্ছি তোমায়।

ডিনারের পর ড্যাডের ফোন এল। জানা গেল টিকিট এগিয়ে আনা হয়েছে ১১ দিন। অর্থাৎ তিন দিনের মাথায় ট্রিনার যাত্রা। যার ডাকে হাজার মাইল পারি দিল ট্রিনা, তাকে একবার না জানিয়ে ফিরে যাওয়াটা অভদ্রতা। কিছুটা এক্সপ্ল্যানেশন সে অন্তত দাবী করে।

– হাই, রূপক! আমার বিকেলের বিহেভিয়ার এর জন্যে সরি।

– কিন্তু কেন চলে গেলে ওভাবে?

– আমার আসা উচিত হয়নি এভাবে। আমি পরশু ফিরে যাচ্ছি। আমি আমার রুট এখানে খুঁজে পাইনি। আমি ব্রিটিশ। ইন্ডিয়ার সাথে আমার কোনো কানেকশন নেই।

– কি বলছ! তোমার নিজের মা, তুমি জানো সে কত আপ্সেট তুমি এভাবে চলে আসায়

– ইজ ইট? আমার দিকে চেয়ে একটা ওয়ার্ড বলেনি কেন তাহলে? ট্রুলি স্পিকিং আমার ভীষণ রিপালশন হয়েছে ..... আমি এর থেকে বেরতে চাই ..... বিরাট ভুল করে ফেলেছি।

– তোমার মত করে তার মধ্যেও কিছু চলেছে হয়ত। ..... তুমি জানো কত স্ট্রাগল করেছিল সে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে। তোমার এই বেঁচে থাকার, একটা সুন্দর জীবন পাবার জন্যে তোমার মায়ের একটা কন্ট্রিবিউশন আছে তো!

– আমাকে বাঁচিয়ে রাখার, আমার সুন্দর জীবনযাপনের সম্পূর্ণ দায় আমার মম ড্যাডের, আর কারো কোনও ভূমিকা নেই। সে আমাকে তখনই মেরে ফেললে আমি কিছু বোঝার আগেই চলে যেতাম। ক্ষতি কিছু ছিলনা।

– ছিল ট্রিনা। আজ যে এক্সিসটেন্স নিয়ে তুমি এত কনশাস, তুমি আছ বলেই তোমার রুট কোথায় কে তোমার বাবা মা এসব ম্যাটার করছে। তোমার এক্সিস্টেন্সটুকু ছাড়া সব প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন হত। তুমি তোমার মায়ের কাছে আর একবার যাও ট্রিনা। একবার দুজন মুখোমুখি কথা বল। মানছি তোমাকে জন্ম দেওয়া দেশের সেই গ্ল্যামার নেই যা তোমাকে বড় করা দেশের আছে।

তোমার জন্মের দেশ গরীব। কিন্তু নিজের মায়ের ভেতরে একবার চেয়ে দেখ ট্রিনা, তুমি ওপরের মালিন্য ভেদ করে নিশ্চই কিছু দেখতে পাবে। এবং আমি জানি যদি জানতে পারো তাঁকে, তোমাকে সারাজীবন গর্বিত করবে এঁর মেয়ে হবার জন্যে। আর একবার তুমি এস, আর প্লীজ বাইরে থেকে না দেখে একটু ভেতরের চোখ খুলে দেখার চেষ্টা কর। তোমার মাকে শুধু নয় ট্রিনা, এই দেশটাকেও ভেতরের চোখে দেখার চেষ্টা করে দেখো। এরপর তুমি চাইলেও হয়তো তোমার মাকে আর দেখতে পাবেনা। উনি ক্যান্সার নিয়ে আর বেশীদিন সারভাইভ করবেন না। প্লীজ ট্রিনা!

– ইউ মিন ইনসাইট ? মম বলে আমার ইন্সাইট খুব ভাল। এনিওয়ে, কাল যাব একবার দেখা করতে। বাট তুমি থেকো। থ্যাঙ্ক গড,এট লিস্ট আমি তোমার সাথে কিছুটা রিলেট করতে পারছি

– থ্যাঙ্ক ইউ!

(৬)

লাবণ্য আজ ওর সবচে ভাল শাড়িটা পরল। সাদার ওপর তুঁতে ফ্লোরেল প্রিন্ট এর কোটা। কালো চুলে দু চারটে রূপলী ছিট সাততাড়তাড়ি হাজির হয়েছে। স্যালোন যাবার তো প্রশ্নই আসেনি কখনও। শীর্ণ হাতের শিরাগুলো কেমন ফুলে উঠে বিশ্রী লাগছে। গায়ের রঙেও আজ ছ মাস হল কে যেন কালী ঢেলেছে। চোখের কোল বিবর্ণ। তৃণার মুখের দিকে লুকিয়ে চুরিয়েও একবার তাকাতে পারেনি কাল। কিন্তু ওর ট্যাটু করা ডান হাতের ওপর চোখ পড়েছিল লাবণ্যর। গায়ের রঙ খানা বাপের মত মাজা মাজা পেয়েছে।

লাবণ্যর ওই বয়েসের উজ্জ্বলতার ছিটেফোঁটা নেই তো! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যুগ যুগ পরে অপূর্বর স্পর্শ অনুভব করল লাবণ্য। ওদের সন্তান, ওর আর অপূর্বর ভালবাসার সন্তান .....। ক'টা মাত্র স্বপ্নের দিন। অপূর্ব তার ঘোরতর সংসারী স্ত্রীর কাছে দুটি সন্তানের পিতৃত্ব ছাড়া কিছুই পায়নি। সে যখন উজার করা ভালবাসার ঝুলি নিয়ে কাঁচা বয়েসের লাবণ্যর সামনে দাঁড়িয়েছিল, বোধ বুদ্ধি বিবেক, সব লোপ পেয়েছিল লাবণ্যর। ভেসে গেছিল এক পরিপূর্ণ স্বপ্নের আস্বাদে।

কিন্তু কাপুরুষের মতন বলেছিল, ভাল সে লাবণ্যকেই বাসে তথাপি বাচ্চা এবং লাবণ্যর দায়িত্ব সে নিতে পারবে না। একটু সময় দিলে ডিভোর্সের চেষ্টা আস্তে আস্তে করবে কিন্তু এই শিশুকে আসার আগে হত্যা করতেই হবে।

সেইদিন সেই মুহূর্তে লাবণ্য বুঝেছিল তার রূপকথার রাজকুমার একটা কাপুরুষ মাত্র। নিজের কৃতকর্মের দায় নেবার ক্ষমতা নেই যার তার প্রতি অশ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল মন। ছেড়ে গেছিল অপূর্বকে সেই মুহূর্তে, চিরতরে। অপূর্বও আর সাহস করেনি লাবণ্যর সামনে এসে দাঁড়াবার। বই টই লিখে যথেষ্ট বিখ্যাত মানুষ হয়ে উঠেছে। টিভির পর্দায় বা ম্যাগাজিনে দেখতেই হত মানুষটাকে। বছর দুয়েক আগে স্ট্রোকে বাঁদিকটা পড়ে গেছে বলে খবর শুনেছিল।

লাবণ্য বারান্দায় বসে ছিল ওদের আপেক্ষায়। উবার থেকে নেমে সটান দরজায় এসে দাঁড়াল ট্রিনা, লাবণ্য ধীর পায়ে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল। ইংলিশে বলল

– এস

– দিদি তুমি আর ট্রিনা কথা বল, আমি বাইরে আছি .....

– না রূপক তুমি থাকৃ ট্রিনা ওকে জোর করলে রূপক ঘরে ঢুকল।

– তুমি ফিরে যাচ্ছ ?

– যাচ্ছি।

– আমার তোমাকে কিছু বলার আছে।

– শুনছি, এখনও অব্দি ট্রিনা তাকায়নি লাবণ্যর দিকে। লাবণ্য আজ শুরু থেকেই ট্রিনার চোখে চোখ রেখেছে। মনের সাধ মিটিয়ে মেয়েকে দেখে নিচ্ছে। খুঁজে নিচ্ছে আতি পাতি মেয়ের মধ্যে তার নিজের অংশটুকু।

– তোমার ডান কানে একটা বার্থ মার্ক থাকার কথা .....

ট্রিনা চুল সরিয়ে দেখাল ..... লাবণ্য তার চোখ ভিজে আসা প্রাণপণ আটকাচ্ছিল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। ট্রিনা তখনও কিছুটা শক্ত হয়ে বসা। রূপক ট্রিনার হাতে একটা চাপ দিয়ে বলল

– প্লীজ তোমরা কথা বল। আমি বাইরে আছি।

– তৃণা, তোমার জন্ম দিয়েও আমি নিজের কাছে ধরে রাখতে পারিনি, তোমাকে ভাল রাখার ক্ষমতা আমার ছিলনা। আমার লড়াইতে তোমাকে সামিল করলে তুমি এমন সুন্দর একটা জীবন পেতে না। তাই তোমাকে হোমে রেখে এসেছিলাম। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব ভাল কাজ করেছি। আমি তোমাকে পাইনি কিন্তু এই পৃথিবী তোমাকে পেয়েছে। তুমি তার পাওনা মিটিও কিন্তু। কেবল নিজের জন্যে বেঁচে থেক না। তাহলে আমার তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইটা সার্থক মনে হবে।

– তোমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি হাঁপাচ্ছ ..... থাক

– আজ না বললে আর তো সুযোগ পাব না। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে এবং তোমার বাবা মা কে যাঁরা তোমাকে এদেশে আসার পার্মিশন দিয়েছেন। খুব ভাল আপব্রিঙ্গিং হচ্ছে তোমার .....

ব্যাগের ভেতর থেকে একটা প্যাকেট বের করল তৃণা, লাবণ্যর হাতে দিল।

– আমার ছোটোবেলার কিছু ছবি আছে। তুমি দেখো

– থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ! তুমি এতবড় উপহার নিয়ে এসেছ আমার জন্যে?

তোমাকে বড় হতে দেখিনি বলে তুমি .....

– আর যদি আমাদের কোথাও ভুল হচ্ছে, যাতে তুমি চিনে নিতে পারো – সেইজন্যেও এনেছি।

লাবণ্য উঠে গিয়ে একটা বাঁধানো রঙ্গিন কিন্তু ফিকে হয়ে আসা একটা ছবি নিয়ে এল, যেখানে অল্প বয়েসের লাবণ্যর কোল জুড়ে হাসি মুখে শুয়ে আছে তিন মাসের তৃণা। ছবিটা হাতে দিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল লাবণ্য। প্রথমে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল তৃণার, তারপর গালের পেশীগুলো কাঁপতে লাগল মৃদু মৃদু, সবশেষে চোখের কোল উপচে বড় বড় ফোঁটা পড়ে তৃণার কোল ভিজে যেতে লাগল। লাবণ্য উঠে এসে মেয়ের পিঠে আলতো চাপ দিল। তৃণা দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে যেতে লাগল। লাবণ্য আস্তে আস্তে মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, তবু যেন হাত ভরা দ্বিধা। মা মেয়ে কেউ যেন মাত্রা ছেড়ে এক বিন্দু এগোবে না। ভীষণ এক পিছুটান ওদের আবেগকে সীমার এপারে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

– হ্যাঁ এ আমারি ছবি। তুমি তো সুন্দরী ছিলে কত, এ কেমন চেহারা করেছ! তুমি মম এর চেয়ে কত ছোট। আর ...

– আমি নিজের দিকে দেখিনি। তুমি চলে যাবার পর ওই স্কুলের কাজটুকুই আমার জীবন। আর এখন তো এমন অসুখ হল, মনে হয়না আর সময় বেশী আছে আমার।

– কিন্তু কেন নিজের ক্ষতি করলে তুমি? কার জন্যে এই স্যাক্রিফাইস? আমার জন্যে নাকি আমার বাবার জন্যে? শুনেছি তিনি ফেমাস ইকোনমিস্ট। আমিও তো খুব ভাল রইলাম, কার জন্যে নিজেকে এমন কষ্ট দিলে বল?

– কষ্ট তো দিইনি? আমি আমার কাজ করেছি।

– না দায়িত্বের জন্যে না, নিজের জন্যে বাঁচনি কেন। কেন তুমি নিজের ফ্যামিলি করনি নতুন করে?

– সাহস বা ইচ্ছে কোনওটাই হয়নি বলে। অপূর্বকে ভালবেসে আমার বাবার মন একেবারে ভেঙে দিয়েছিলাম। উনি চলেও গেলেন আমার দেওয়া আঘাত বুকে নিয়ে। সেই কারণে আমার বাড়ির সকলে আমার ওপর রেগে গেল। তারপর তোমাকে জন্ম দেবার অপরাধে আমাকে সবাই চিরতরে ছেড়ে দিল। সেই থেকে স্কুল, ছাত্রীরা – আর কিছু ভাবিনি। – কি নিষ্ঠুর এই দেশ! এখানে মানুষের নিজের মত বাঁচার অধিকার নেই?

– তুমি ঠিক বলেছ, সত্যি কুসংস্কার আর নিষ্ঠুরতায় ভরা এই দেশ। মূল্যবোধ তো সময় আর স্থান ভেদে ভিন্ন হয়। আর এব্যাপারে এদেশের সমাজ খুব জাজমেন্টাল। কিন্তু আমার মত যারা সমাজের নিয়ম ভাঙেনি, তারা কিন্তু ভালবাসা আর মায়া মমতার এক নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার বলয়ে বাস করে। তাই একাকীত্ব ডিপ্রেশন এসব খুব কম ছুঁতে পারে এদের। তবে আজকের জেনেরাশন যখন পুরোনো নিয়মকে উড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন ইচ্ছাকে মূল্য দিচ্ছে তাদের জীবনে কেন কপ্লিকেশন আসছে, যার সাথী হয়ে ডিপ্রেশন জায়গা নিচ্ছে বুঝতে পারিনা।

– স্ট্রেঞ্জ! আমি এই দেশ দেখতে চাই। তুমি যাবে আমার সাথে, আমার গাইড হবে?

– কি বলছ তুমি? তোমার যে টিকিট চেঞ্জ হয়ে গেছে?

– তা হোক! তুমি কি পারবে?

– তুমি ভেবে দেখ তৃণা, আমার জন্যে তুমি ভেব না। তাছাড়া আমি অসুস্থ।

– আমি ডক্টরের সাথে কথা বলব।

তৃণার রেখে যাওয়া প্যাকেট হাতে নিয়ে বসেছে লাবণ্য। মনটা আজ তার হালকা ফুরফুরে। এমন দিন তার আপেক্ষায় আছে এ সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

বাঁচতে বড় লোভ হচ্ছে এবার।

তৃণা ফেরার পথে ড্যাডের ফোন এল।

– হাই হানী

– হাই ড্যাড

– তুমি রেডি তো?

– না ড্যাড, ভাবছি আমি আর একটু থেকে যাব। মম বলছিল ইন্ডিয়া দেখতে। নাউ আয়াম ইন্টারেস্টেড

– বাট হানী, তোমার টিকিট চেঞ্জ করলাম।

– লিভ ইট ড্যাড, আমি ফেরার টিকিট কেটে নেব পরে, সময়মত

– দ্যাটস ফাইন। বাই দ্য ওয়ে, তুমি কি তোমার মা কে মিট করেছ আবার?

– ইয়েস ড্যাড!

– আই সী! সে কি তোমাকে ফোর্স করছে বা এমোশনালী ব্ল্যাক্মেইল করছে?

– নো ড্যাড। তেমন কিছুই না। উনি খুব ভাল। আমি ইন্ডিয়া দেখতে চাই ড্যাড, প্লীজ ডোন্ট ওরি, লাভ ইউ বোথ!

****

মহুয়া কাঞ্জিলাল

রুইসারা তাল ট্রেকের গল্প

বরসামবসেরা চলল রুইনসারা

বেশ কেমন একটা হ জ ব র ল শোনা যাচ্ছে না । আমার জীবনের প্রথম ট্রেকিং এর গল্পে বরসামবসেরা এক গুরুত্বপূর্ণ নাম । তাই প্রথমেই বরসাম বসেরার পরিচয়টা সেরে ফেলি । এ হল আমাদের গ্রুপের নাম — কনিষ্ঠ সদস্যা শ্রেয়সীর (বয়স ১১ হলে কি হবে তিনিই আমাদের দলের নেত্রী, তাঁর ইচ্ছে আমাদের সর্বদা শিরোধার্য) দেওয়া । প্রতিটা সদস্য আছে এই নামের মধ্যে । বরুণ একজন পাকা পর্বতারোহী, বহু নামকরা শিখর ছুঁয়েছে এর আগে — এমন অভিজ্ঞ লিডার পেয়ে আমরা যারপরনাই আপ্লুত । সুমিত দা সত্তরোর্দ্ধ এক পরিব্রাজক যুবক । রণোজিৎ (রণো) আর আশীষদাও যথেষ্ট অভিজ্ঞ হিমালয়ে হন্টনের ক্ষেত্রে । আর আমার বন্ধু স্বাতী, সে কদাচিৎ সমতলে পা রাখে — মোদ্দাকথা হল, আনাড়ীর দলে আমরা কত্তা (মনীশ) — গিন্নী (মহুয়া) আর অভিজিৎ দা । তবু মনীশ আর অভিজিৎ দা গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে যাবে তার একটা কদর আছে, আমি বেচারা হাত দুলিয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে রুইনসারা পৌঁছোবো — এমন স্বপ্ন গত এক বছর ধরে দেখে আসছি । তবুতো কৃষ্ণনগরের এক মেয়ে সেই ছোট্টবেলায় দেখা স্বপ্ন 'মাইন্টেনিয়ারিং' করার — কিছুটা হলেও ছুঁতে পারবে ।

আমরা দুজন সেপ্টেম্বরের শেষে দিল্লী পৌঁছেছি, মূলত জেটল্যাগ কাটিয়ে ট্রেকিং শুরু করবো সেই আশায় । বাকি টিম রওনা দিল অক্টোবরের ২ তারিখ রাজধানীতে চেপে রাজধানীর উদ্দ্যেশ্য । ৩রা অক্টোবর দিল্লী ষ্টেশনে হল আমাদের 'মহামিলন' । এক দুজন ছাড়া কেউ কাউকে তেমন চিনিনা । তার ওপর আমরা আবার এসেছি বিলেত থেকে । বুঝতেই পারছি আমাদের নিয়ে আশঙ্কা অনেক । দেরাদুন পৌঁছোতে সেদিন রাত হয়ে গেল । হোটেলের সামনের ধাবায় খাবার ছিল অমৃত সমান । কোনরকমে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে যাত্রা সাঁকরির উদ্দ্যেশে । দেরাদুনের রাস্তায় কয়েকটা বাঁক ঘুরতেই ধীরে ধীরে উন্মোচিত হল 'হিমালয় — যেন মৌন ঋষির মত মগ্ন ধ্যানে' ।

কত বছর, যেন কত যুগ পর আবার এত কাছ থেকে দেখবো হিমালয়কে ! কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হিমালয়ের মৌনতা ভঙ্গকরা লোকে লোকারণ্য মুসৌরি পৌঁছালাম- এখানে চট করে প্রাতরাশ ! নানা রকম পরোটা, আচার দই নিমেষে শেষ হয়ে গেল বুভুক্ষু ন'জনের সামনে । আবার চলা শুরু । গানে গানে এই পথ চলাটা ছিল বড়ই মধুর । বাইরে শুধুই মুগ্ধতা । মাঝে মাঝে থামতে বাধ্য হলাম আমরা আর একটু ভালো করে দেখার আশায় । পথে পরল যমুনার প্রধান উপনদী তমসা (টনস্) । হৈ হৈ করে গাড়ি থামিয়ে নেমে পরলাম তার তীরে । নদী বয়ে আনা নানা আকৃতির পাথরে ভর্ত্তি তার বাম তীর — সে সব ডিঙিয়ে স্পর্শ করলাম হিমবাহ গলা স্বচ্ছ তমসার জল । তখনো জানিনা এইরকম এক নদী আমাদের চলার পথের সঙ্গী হবে পরের এক সপ্তাহ । মুগ্ধতার রেশ কাটার আগেই আবার চলা শুরু — সন্ধ্যে নামার আগে সাঁকরি পৌঁছোতে হবে । উত্তরাখন্ড হিমালয়ের প্রবেশদ্বার এই ছোট শহর — শহর না বলে পাহাড়ি বসতি বলা ভালো । গোবিন্দবল্লভ পন্থ জাতীয় উদ্যানের অন্তর্গত হিমালয়ে ঘেরা এই নিস্তরঙ্গ শহর ছবির মতই সুন্দর । এখানে ইলেকট্রিকের থাম — তার সবই আছে বটে কিন্তু তার দেখা মেলেনা । এর পর আর মোবাইলের সংযোগ থাকবে না, তাই অনেকেই বাড়ির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালিয়ে বিফল । আমার কোন চিন্তা নেই, মুঠোফোনকে সুটকেস বন্দী করে রেখে এসেছি দিল্লীর হোটেলে । সেদিন রাতে টর্চের আলোয় প্রথম টিম মিটিং হল যাতে আমি নিশ্চিন্ত হলাম এযাবৎ যত ভ্রমণ করেছি তাকে ছাপিয়ে অন্য অভিজ্ঞতা পেতে চলেছি হিমালয়ের পথে ।

রাত কাটলো প্রতীক্ষায় ।

সীমা'র মাঝে অসীম

'ম্যাডামজি চা' — সমুধুর ডাকে বুঝলাম সকাল হলো সাঁকরিতে। লেপের ওম ছেড়ে বাইরে আসতেই টের পেলাম প্রায় ২,০০০ মিটার উচ্চতার ঠান্ডা। 'বেড টি — আমার জীবনে এই প্রথম। মুখ না ধুয়ে চা। স্বাতীর ধমকে চা-পান সারলাম। মনে মনে নিজেকে তৈরী করলাম — 'জীবনে করিনি' এসব মানসিক বেড়াজাল থেকে মুক্ত হবার সময় এসেছে এবার।

বারান্দায় বেরিয়ে রোদমাখা স্বর্গ রোহিনী রেঞ্জ দেখে ট্রেকিং এর ক্ষিদেটা আরো বহুগুণ বেড়ে গেল। আর মাত্র কিছুক্ষণের অপেক্ষা। ৭.৩০ টা নাগাদ বিনোদসিংজী (যাদের তত্ত্বাবধানে থাকবো আমরা) একটা ছোট বক্তৃতা দিলেন — পাহাড়ে কি করা উচিৎ, বা অনুচিৎ তা নিয়ে। হিমালয়কে এরা দেবতাজ্ঞানে মানেন তা প্রতিটা কথায় পরিষ্কার। আরো যেটা ভালো লাগলো তা হল পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতনতা। বাকি হিমালয়ের কি অবস্থা আমার জানা নেই — তবে আমরা পরের ৬ দিন যে রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি তা সত্যিই মলিনতা মুক্ত। বিনোদের বাবা রামসিংজী গাইড হিসেবে যোগ দিলেন আর জুটলো ছটু। আমাদের দেওয়া ছটু নাম ছাড়া, অজয় ওর ভালো নাম। ভারী মিষ্টি বছর ১৬-১৭র একটি ছেলে। টেন্ট লাগানো থেকে রান্নায় সাহায্য — সবেতে ছটু হাসিমুখে হাজির।

৫ই অক্টোবর, বরসাম বসেরার ৯ সদস্য, রামসিংজী, ছটু এবং রান্নার সরঞ্জাম সহ জীপ রওনা হল ৬ কিলোমিটার দূরের তালুকার উদ্দ্যেশে। এই রাস্তাটুকু নাকি 'মটোরেবল্' (Motorable) ! এ যদি মোটর যাওয়ার রাস্তা হয়, তবে আমি ইংল্যান্ডের রাণী ! জিপটা সারাক্ষণ নৌকার মত দুলে দুলে চলল — তার পেটের মধ্যে বসে বুঝতেই পারছি বড় বড় বোল্ডারের ওপর দিয়ে, খাড়া ঢালের কান ঘেঁসে, কখনো তীব্রগতির জলপ্রপাতের মধ্যে দিয়ে চলেছি। জীপের মাথায় চেপে রণো-বরুণ-মনীশ আর আশীষদার অভিজ্ঞতা আমি কল্পনা করার দুঃসাহস করবোনা এর থেকে নাক্‌খত দিতে দিতে ৬ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দেওয়া সহজ ছিল ! অনন্ত সময় কাটার পর (ঘড়ি অনুযায়ী ৪০-৪৫ মিনিট) লালফুলে ঢাকা পাহাড়ের কোলে তালুকা গ্রাম এলো। এখানে মহাদেবের মন্দিরে পুজো দিয়ে 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি তুলে অবশেষে আমাদের ট্রেকিং হল শুরু। এদিনের যাত্রা ২,৫৬০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত সীমার উদ্দ্যেশে — দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার। বীরবিক্রমে হাঁটা শুরু করলাম। এখান থেকে এক নীল ঘাঘরা পরা উচ্ছল নদী আমাদের সাথী হল। রামসিংজী বললেন নদীর নাম সুপিন। ততক্ষণে জেনেছি রাস্তার দুদিকের লালফুলের ক্ষেত আসলে রামদানা নামে শষ্যের। রামদানার শোভার মাঝে দু একটা বাড়ি, তার উঠোনে গাড়োয়াল কন্যের এক ঝলক মুখ — এসব পেরিয়ে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকা জঙ্গল। বড় বড় আখরোট গাছের পাতায় রং লেগেছে শরতের, এছাড়া রয়েছে চির পাইন ও আরো নাম না জানা গাছ। নদীকে বাঁ দিকে রেখে চড়াই রাস্তা কিন্তু যথেষ্ট চওড়া। এভাবে প্রায় ৩-৪ কিলোমিটার মত চলার পর নদী পার হয়ে অন্য পাহাড়ে এলাম। একটু উঠে সবুজ চাতাল — পদযুগলকে একটু স্বস্তি দেওয়ার জন্যে প্রথম 'ব্রেক' নেওয়া হল। এর মধ্যে পথে বেশ কয়েকটা ট্রেকিং দলের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যারা হর কি দুন যাচ্ছে। এই চাতালে এসে দেখলাম হিমালয়েও ভীড় হয় !

বসার কি উপায় আছে ! রামসিংজী আর বরুণ দুজনেই এক সাথে তাড়া দিল। এই চাতাল থেকে এবার ডানদিক বাঁক নিয়ে চলা শুরু। রাস্তা আর নেই। এবার শুধুই এ পাথর - ও পাথর ডিঙিয়ে কখনো খাড়া নীচে নামা অনেকটা, তারপরই আবার ওঠা শুরু। ততক্ষণে গরম লাগতে শুরু করেছে, ফলে পাতলা জ্যাকেটটা কোমরে জড়িয়ে নিয়েছি। ফুরফুরে মন আর একটা ছোট্ট ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে এই ট্রেকিং পথ তুলতে তুলতে চলেছি। হঠাৎ পতন। সামনে দাঁড়িয়ে রামসিংজী হাঁ হাঁ করে উঠলেন সাথে মনীশ ও। কারণ খাদটা ছিল বেশ গভীর। আমি কিন্তু বেশ চেয়ারে বসার মত পাথরের খাঁজে আটকে গেলাম। জ্যাকেট আর ট্রাকশুট কাদায় মাখামাখি হল, আমার এতটুকু আঘাত লাগলোনা, ভারি আশ্চর্য্য। একটু সামলে নিয়ে ফাঁকা জায়গা খুঁজে দাঁড়াতেই এবার বরুণের বকুনি। জ্যাকেট আর ক্যামেরা ওর রাকস্যাকে ঢুকিয়ে তবে শান্তি। নাহ ! এবার বেশ হাল্কা লাগছে বটে ! এরপর শুরু তস্য সরু রাস্তা আর তার সাথে

মালবাহী খচ্চরদের পাশ কাটানো। আগের রাতের টিম মিটিং এ শুনেছি এদের জায়গা দেবার জন্যে সবসময় পাহাড়ের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে হবে, কদাপি ঢালের দিকে নয়। সে কথা অক্ষরে অক্ষরে মানা সত্বেও এক বেটা দিল আমায় বেজায় ধাক্কা — কি তার গায়ের জোর। পুরো হুড়মুড়িয়ে পরলাম সুমিতদার ঘাড়ের ওপর। আহা উহু করার তো সময় নেই, তাই আবার চলতে শুরু করলাম। এতক্ষণে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক কমে এসেছে — অর্থাৎ আমরা বেশ উঁচুতে উঠে এসেছি যেখানে পোকামাকড় নেই। কতটা হাঁটলাম জানিনা, কতটা বাকি তাও জানিনা, কিন্তু মোক্ষম ক্ষিদের ডাক জানতে পারছি ততক্ষণে। অবশেষে লাঞ্চ ব্রেক হল বিশাল বৃক্ষরাজি ঘেরা এক পাথুরে চাতালে। গাছের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসে রুটি আলুসিদ্ধ খাওয়ার যে কি আনন্দ তা বোধহয় এরকম ট্রেকিং-এ না এলে বোঝা অসম্ভব।

এখানে চায়ের দোকান আছে কিন্তু সেদিন বন্ধ। ওদিকে অভিজিতদা বহুক্ষণ থেকে চায়ের তেষ্টায় অস্থির। চা তো জুটলোনা, কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে জল জুটলো। রামসিংজীকে জিজ্ঞেস করে রাস্তার ধারের ঝোরা থেকে বেশ কয়েকটা বোতলে জল ভরে দিল অভিজিত দা। আমার বোতলে জলের সাথে বেশ কিছু শেওলাও জুটলো।

আবার দেখা সুপিনের সাথে। পাহাড়ের দুপাশ থেকে অজস্র নাম না জানা সুন্দরী ঝর্ণা লাফাতে লাফাতে সে নদীতে মিশছে। ঘন্টাখানেক হাঁটার পর হাতে চাঁদ পাওয়ার মত একটা চা-কফির দোকান পাওয়া গেল। দূরে নদীর অন্যপাড়ে গাঙ্গাড় গ্রাম। ঘড়িতে তখন প্রায় ৪টে। অর্থাৎ এবার আমাদের পা চালাতে হবে সন্ধ্যার আগে পৌঁছোতে গেলে। পা তো আর চলে না, হিসেবের ১৪ কিলোমিটার তো বহু আগে পেরিয়ে আসার কথা ! এখান থেকে একটু ওপরে উঠে প্রথম একটা মাঝারি সাইজের ঝর্ণা পরলো — রামসিংজি হাত বাড়িয়ে দিলেন — বরুণ দেখিয়ে দিল একটা গোল মত পাথরে যেন কেউ পা না দেয়। কি অসম্ভব অভিজ্ঞতা থাকলে এভাবে পাথরের চরিত্র বিচার করা সম্ভব তা আমি পরে বহুবার ভেবেছি। ট্রাপিজের খেলার মত আমরা একে একে সবাই পেরোলাম।

দিনের আলো কমে আসছে, তাঁবুর দেখা নেই। আমি এবার চলেছি রণোর সাথে। ও টর্চের আলোয় যেভাবে পা ফেলছে, তা অন্ধের মত অনুসরণ করতে করতে চলেছি। সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ তাঁবুর কাছে পৌঁছালাম। বাঁদিকে বয়ে চলেছে সাথী সেই নদী। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। শরীর অবসন্ন কিন্তু একি অপার তৃপ্তি এর আস্বাদ তো আগে কখনো পাইনি।

মাঝের পাড়ার (মাঝের টেন্টের) বাসিন্দা হলাম আমি স্বাতী আর শ্রেয়সী। কত কিছু জানার বাকি তখনো আমার। প্রথম টেন্টে ঢোকা, স্লিপিং ব্যাগ — উত্তেজনার যেন কোন শেষ নেই। নতুন জানলাম টয়লেট টেন্টের ধারণা। আমার তক্ষুনি দেখে আসা চাই। চাঁদের আলোয় কয়েকবার প্রদক্ষিণ করাই সারা হল, তার প্রবেশদ্বার খুঁজে পেলাম না।

স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে বেশ শুঁয়োপোকার মত গুটুলি পাকিয়ে ঘুমের দেশে তলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আমার ভৌগলিক সত্ত্বা জাগ্রত হল — একবারতো দেখে নিলামনা পাহাড়ের ঢালটা, কোন ধ্বস নামার মত সম্ভবনা নেই তো !

সীমার সাথে পরিচয় হল পরদিন ভোরের মায়াবী আলোয়।

*** *** ***

পায়ে পায়ে রয়েনবসেরা

৬ই অক্টোবর সুপিন নদীর জলতরঙ্গে ঘুম ভাঙলো সীমায়। সকাল ৬টা নাগাদ তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে দেখলাম ভৈরবী রং এ মাখা সীমার রূপ। আগেরদিন রাতে পৌঁছে কিছুই বুঝতে পারিনি, শুধু নদীর গর্জন শুনে মনে হয়েছিল প্রচন্ড খরস্রোতে বয়ে চলেছে সুপিন তাঁবুর কাছ দিয়ে। দুপাশের পাহাড় কেটে গভীর গিরিখাত করে চলেছে সুপিন, আর সেই এক পাহাড়ের ছোট চেয়ার মত পাথুরে অংশে রাত কাটিয়েছি আমরা, আর অন্য পাহাড়ে দেখা যাচ্ছে ওসলা, গাড়োয়াল হিমালয়ের সর্বশেষ গ্রাম — দূর থেকে মনে হয় শিল্পীর তুলিতে আঁকা। পাহাড়ের ঢালে অসংখ্য ধাপচাষের

উর্বর জমি । দুই পাহাড়ের সংযোগ রক্ষা করছে সুপিনের ওপর এক শক্তপোক্ত সুদৃশ্য ব্রীজ । হর-কি-দুন যাবার রাস্তা এই ব্রীজ পেরিয়ে নদীর ডানতীর ধরে, আর আমরা চলবো সুপিনের বাম তীরের পাহাড় ডিঙিয়ে ।

রোদ্দুরে পিঠ সেঁকে চিড়ের পোলাও আর দুধ-কর্নফ্লেক্স দিয়ে আমরা প্রাতরাশ সারলাম । এরকম দূর্গম জায়গায় বসে সুস্বাদু চিড়ের পোলাও পরিবেশনের সব কৃতিত্ব গ্রুপের রাঁধুনি মুমচাঁদের, যে সীমাতে যোগ দিয়েছে আমাদের সাথে । ব্রেকফাস্টের পর মাঝেরপাড়ার অস্থায়ী সংসার রাকস্যাকে পুরে প্রস্তুত সেদিনের যাত্রার জন্যে । কিন্তু আটকে দিল এক পাল ভেড়া । নাহ্, নিষ্পাপ ভেড়ার পালের কোন দোষ ছিল না । যে গ্রুপে নয় নয় করে ন'জনের মধ্যে ছজন ফটোগ্রাফার — তারা সামনের পাহাড় থেকে একপাল সাদা ভেড়া, গায়ে সকালের নরম রদ্দুর মেখে নেমে আসছে, এমন ছবির সুযোগ কি হেলায় হারাতে পারে । ফলতঃ প্রত্যেকে তাদের দশাশয়ী ক্যামেরা তাক করে পজিশন নিয়ে নিল ! সে এক অসাধারণ দৃশ্য বটে !

মেষশাবকদের ফটোশুট শেষ হলে দুগ্গা দুগ্গা করে পথে নামলাম । প্রথমেই পেরোলাম এক সুন্দরী ঝর্ণা, এদিনের যাত্রাপথ নাকি অপেক্ষাকৃত সহজ এমনই দাবী বরুণের । প্রথম ঘন্টাখানেক হেঁটে বরুণের কথাকে প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছি এমন সময় শুরু হলো সুপিনকে বাঁদিকে রেখে চড়াই রাস্তা । প্রতিটা বাঁকে যেন হিমালয় নতুন রূপে দেখা দিচ্ছে এখানে । দূরে শুভ্রধবল স্বর্গরোহিনী রেঞ্জের বেশ কয়েকটা শিখর দৃশ্যমান, এই বিশালতার কোন শেষ নেই । রূপে মুগ্ধ হবার বেশিক্ষণ সময় না দিয়ে এবার শুরু হল কয়েকশো মিটারের খাড়া পথ । চোখের সামনে শুধুই পাথর তখন । তার মধ্যে দিয়ে আবার জলের ধারা বইছে, ফলে মারাত্মক পিছল । আমার সামনে অবলীলায় চলছে সুমিতদা । আর আমি অতি সন্তর্পণে লাঠি ঠুকে, দম ফুরিয়ে কোন রকমে এপাথর ধরে, ও পাথরে ঠেস দিয়ে অবশেষে পেরোলাম এই খাড়াই অংশ । ওপরে উঠে দেখি প্রায় প্রাইজ দেবার মত এক প্রশস্ত চাতাল আর সেখানে নিলাম এদিনের প্রথম ব্রেক । সুপিনের গিরিখাত এখানে এতই গভীর সেভাবে জলের আওয়াজ অবধি শোনা যাচ্ছেনা ।

আবার হন্টন শুরু, পাহাড়ের প্রায় মাথা দিয়ে হাঁটছি এবার । এসবের মধ্যে মুখে মুখে একের পর এক কবিতা তৈরী হচ্ছে পথে । তিনজন স্বাভাব কবি (কিছুটা অভাবেও বটে) — শ্রেয়সী, অভিজিতদা এবং মনীশ কৃত এমনই এক কবিতা —

'গা হয়ে গেছে গরম
লাগেনা কোন শরম
খুলে ফেলেছি জামা
তাপ দিচ্ছে সূয্যি মামা'।

গিরিরাজ নিশ্চই মনে মনে হেসেছেন সেদিন । সূয্যি মামার প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে সাক্ষাৎ হল এক প্রশস্ত বুগিয়ালের সাথে । এতদিন শুধু বুগিয়ালের নামই শুনেছি । এতক্ষণ যে চড়াই-উৎরাই করেছি (রণোর ভাষায় 'সবই তো উঁচু নীচু / এটাতো তবু কিছু') তার থেকে হঠাৎ নিষ্কৃতি পেয়ে পদযুগল একটু অবাক হয়েই বেগ বাড়িয়ে দিল । প্রায় দৌড়ে কিছুটা যাবার পর দেখি রামসিংজী একটা বড় পাথরে অর্ধশায়িত । মানুষটাকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি । যেখানেই একটু বিপদসংকুল রাস্তা, রামসিংজী নিজে দাঁড়িয়ে সবাইকে সাহায্য করছেন, পরক্ষণেই সবার আগে গিয়ে পথ দেখাচ্ছেন । হরিণও বোধহয় চলা দেখে লজ্জা পাবে । যাইহোক, ওনাকে বিশ্রাম নিতে দেখে কোন প্রশ্ন না করে একটা বড় গাছের ছায়ায় আমিও বসে পরলাম । এক এক করে সবাই এসে পৌঁছালো কিছুক্ষণের মধ্যে । রণো আমায় অবাক করে জানালো আমরা নাকি এত তাড়াতাড়ি হেঁটেছি যে অর্ধেকের বেশি রাস্তা পেরিয়ে এসেছি । তাই এই অতিরিক্ত বিশ্রামপ্রাপ্তি । বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করলেও অবিশ্বাসী মন মানতে চায়না । ঘড়িতে তখন ১১.৩০ টা । এরই মাঝে বিশ্রাম ভুলে স্বাতী রামসিংজীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই পথ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে । ওর কাছেই জেনেছি এই জায়গার নাম দেবসু বুগিয়াল । দেবসু বুগিয়াল থেকে প্রথম দেখা গেল কালানাগ এবং বান্দরপুঞ্ছ শৃঙ্গ । বরুণ এই শৃঙ্গ দুটো দেখাতে গিয়ে রীতিমত আবেগতাড়িত বুঝতেই পারলাম । কালানাগ বা ব্ল্যাকপিক শৃঙ্গজয় যে কোন পর্বতাআরোহীর স্বপ্ন আর বরুণ সেই স্বপ্ন সার্থক করে এসেছে কয়েক বছর আগে ।

এরপরই সেই রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া অংশ যা কোনোদিন পেরিয়ে সমতলে পা রাখতে পারবো আশা করিনি। আগেই বলেছি পাহাড়ের প্রায় মাথা দিয়ে হাঁটছিলাম আমরা, এবার ঘন ওকের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নামা শুরু হলো নদীর দিকে। রুইনসারা তাল ট্রেকিংপথের সবচেয়ে খতরনাক অংশ এটা। ঢাল এতটাই খাড়া যে কয়েক মিনিটে শখানেক মিটার নামা হয়ে যায়। পাথরের থেকে ভিজে মাটির পরিমাণ বেশি তাই পা একজায়গায় ব্যালেন্স করে রাখা কঠিন। গাছের শিকড়ে এক পা রাখি তো পরের পা কোথাও রাখার জায়গা নেই। বেশ কয়েকবার রামসিংজী এগিয়ে এসে পার করলেন, কখনো বরুণ, কখনো আশীষদা। কেউ যেখানে নেই আমি স্রেফ টালমাটাল করে সেখানে দাঁড়িয়ে পরেছি। মনে মনে প্রমাদ গুনছি। এই শেষ আমার ট্রেকিং এর। এখান থেকে উদ্ধারের কোন পথ নেই। এমন সময় দেখি আমাদের ছটু মহারাজ চটি পরে এক হাতে ডিমের ক্রেট নিয়ে সেই পথ দিয়ে নামছে। আমাকে ত্রিভঙ্গমুরারির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মিষ্টি হেসে ওর হাত বাড়িয়ে দিল। আমি ধরে প্রাণ পেলাম। এতটুকু বাচ্চা ছেলে, এরকম ভয়ানক রাস্তায় কি অবলীলায় আমায় সাহায্য করতে এগিয়ে এল ! আর আমি নামী দামী ওয়াকিং বুট পরে, ওয়াকিং স্টিক নিয়ে এক পা নড়তে পারছিনা। পাহাড়ের সন্তান ছটু প্রায় নদীর কাছাকাছি আমায় নামিয়ে মুহূর্তে পাহাড়ের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

একটা কাঠের ব্রীজ পেরিয়ে এবার নদীর অপর পাড়ে ওঠার পালা। এখানে বড় গাছের চেয়ে গুল্ম জাতীয় কাঁটা গাছের পারিমাণ বেশি, অর্থাৎ ট্রিলাইন আর বেশি দূর নয়, যার পরে আর গাছ হওয়া সম্ভব নয় অতিরিক্ত ঠান্ডার জন্যে। চেরী গাছ আগেও দেখেছি পথে, কিছু রডোডেনড্রনও, এবার চোখে পড়লো পাহাড়ি বিচুটি। ইংল্যান্ডে এগুলো Stinging nettle নামে কুখ্যাত। নদীকে ডান দিকে রেখে বেলা একটা নাগাদ পৌঁছালাম রুইনসারা উপত্যকার রয়েনবসেরায়। এখানে একটা পাকা ঘর, ঘর বলতে মাথায় ছাদ আর চার দেওয়াল। রামসিংজীর কাছে জানলাম এ পথের যাত্রীদের (যাদের তাঁবু থাকে না) থাকার জন্যে এই বসেরা তৈরী। এই সুযোগে বলে নিই আমাদের বসেরা গ্রুপের নামের উৎস এই রয়েন বসেরা। আধঘন্টার বিশ্রাম আর দুপুরের খাওয়া সারা হতে না হতেই পাহাড়ের কোণে এক মেঘ দেখে বরুণ তাড়া লাগালো। বৃষ্টি আসার আগে তাঁবুতে পৌঁছাতে হবে। সামনের পথ কঠিন নয় কিন্তু অনন্ত যেন। নদীর তীরে তাঁবু দেখা অবধি যাচ্ছে কিন্তু অধরাকে ধরা অসম্ভব। বৃষ্টি এল, আমাদের বেশি ভিজিয়ে দেবার আগেই তাঁবুতে পৌঁছালাম বিকেল ৩ টে নাগাদ।

তাঁবুর মধ্যে বসে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি দেখার অনাবিল আনন্দের কোন তুলনা নেই। বৃষ্টি থামলে মাঝেরপাড়ার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সবাই আমাদের তাঁবুতে এসে বসলো। যদি হই সুজন তো এক তাঁবুতে নজন। গরম স্যুপ, চা পপকর্ণ একের পর এক আসতে থাকলো আর তার সাথে আমাদের আ্যা জমে উঠলো। এমন সময় রামসিংজী জানালেন বাইরে আগুন জ্বালিয়ে পাশে বসার ব্যবস্থা করেছেন। চাঁদের মায়াবী আলোয় ভাসছে হিমালয় আর নদীর পাড়ে কাঠের আগুনের ধারে বসে রণোর এক একটা অভিযানের গল্প — একেবারে made for each other গল্পের মাঝেই ৭টা নাগাদ ডিমের ঝোল, গরম ভাত আর তার সাথে কাষ্টার্ড পরিবেশন করলো মুমচাঁদ।

রয়েনবসেরায় যাবার পথ আর সেই রাত আমার মনের মণিকোঠায় যত্ন করে ধরে রাখবো বহুকাল।

*** *** ***

অবশেষে রুইনসারা

দিনের আলো ভালো করে ফোটার আগেই ঘুম ভাঙলো সেদিন। শীতের আড়ামোড়া ভেঙে গতকালের ধিকি ধিকি আগুনে সেঁকে নিলাম নিজেকে। ম্যাগি আর চা খেয়ে পুরো টিম প্রস্তুত রুইনসারা তাল ট্রেকের শেষ পর্যায়ের হাঁটাটুকু সামলাবে বলে। এদিনও বরুণ বলল মাত্র ৯ কিলোমিটার রাস্তা আর কোনই নাকি 'উঁচু নীচু' থাকবেনা। আর বিশ্বাস করি !! গতদিন যা ভুগেছি তাতে স্বয়ং ভগবান ও এসে যদি বলতেন সামনের পথ কঠিন নয়, তবুও আমি বিশ্বাস করতাম না।

তমসা নদীর তীরে

সাঁকরিতে টিম বরসামবসেরা

বড় বড় পাট গাছের মত গাছের সারির মধ্যে দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। কি গাছ জানিনা। পথ অপেক্ষাকৃত সহজ (অবাক করা ব্যাপার বটে !) তাই আমাদের চলার গতিও ভালোই। মাঝে মাঝে রাস্তা খুবই সরু, হঠাৎ করে একটা দুটো মালবাহী খচ্চরের দেখাও পেলাম। তবে এপথের যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। রুইনসারা তাল ছাড়া, বালিপাসের অভিযাত্রীরাও এ পথেই যায়। এবার রাস্তার ধারে ধারে বুনো বেরী জাতীয় গাছের দেখা পেলাম। ট্রবেরি বা ব্ল্যাকবেরী হতে পারে। কাঁটা গাছ লতিয়ে চলেছে পাহাড়ের ঢালে।

পথটা বড়ই মনোরম। এখন রুইনসারা নদীকে ডান দিকে রেখে চওড়া V আকৃতির উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছি যা প্রথমে হিমবাহ এবং পরে নদীর ক্ষয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। সামনে স্বর্গরোহিনীর শৃঙ্গেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা ধীরে ধীরে সেই দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছি। নদীর ওপর পাড়ের ঢালের পর্ণমোচী গাছগুলোতে কেউ যত্ন করে শরতের রঙ লাগিয়েছে। বাম দিকের পাহাড় থেকে একের পর এক ঝর্ণা নদীতে এসে মিশছে যা কখনো আমরা পাথর ডিঙিয়ে পার হচ্ছি, কখনো বা ঝর্ণার মধ্যে দিয়ে বেশ অরণ্যদেব মার্কা ভঙ্গীতে চলেছি। আর ঝর্ণা যেখানে নদীর আকার নিচ্ছে সেখানে হয় কাঠের সেতু, নয় দুটো গাছের গুড়ির ওপর কয়েকটা পাথর রাখা সেতু। এই পাথর এবং কাঠের যৌথ প্রচেষ্টার সেতু মোটেই সুবিধার নয়। তার থেকে জলে পা ভিজিয়ে পার হওয়া ঢের ভালো।

পুরো রাস্তাই জলবৎ তরলং হবে এবং কোন চমক না পেয়েই আমরা হামাগুড়ি দিয়ে রুইনসারা পৌঁছে যাব তা তো হতে পারে না। সুতরাং এই অপরূপ সুন্দরী ঝর্ণার মাঝে মাঝে গোনাগুনতি সাতখানা ধ্বসের অংশ এলো। বলা যায় দশ পা বাড়াই তো একটা করে landslide আসে। আর সেগুলো ঝুরঝুরে মিহি পাথরের নদীর মত নেমে যাচ্ছে গিরিখাতের দিকে। দুটো পা পাশাপাশি রাখার মত জায়গা যেখানে পাচ্ছি, সেখানে আমি ভাগ্যবতী। এক পা ফেলে, লাঠি ঠুকে দুগ্গা নাম জপে পাহাড়ের দিকে মুখ করে আর এক পা ফেলা। একজন একজন করে এই সব ধ্বস পেরোলাম। এখানে কেউ কাউকে সাহায্য করার নেই। যা কেরামতি সব নিজেকেই করতে হবে। আমি শুধু ভয় পাচ্ছিলাম এমন জায়গায় যদি এক খচ্চর মশাই হেলতে দুলতে আসেন তাহলেই সব খেল খতম।

এরপর প্রকৃতি আবার ঢেলে দিল আমাদের। সামনে বোল্ডারের প্রশস্থ ক্ষেত্র, অর্থাৎ হিমবাহ বাহিত মোরেন। মোরেন হল হিমবাহ বাহিত ছোট বড় পাথর, হিমবাহের চাপ এবং অতিধীর চলনের ফলে মোরেনের আকৃতি সাধারণতঃ গোলাকার এবং মসৃণ প্রকৃতির। হিমালয়ের হিমবাহ অতিদ্রুত গলে যাচ্ছে উষ্ণায়ণের কারণে। মোরেনগুলোর ওপর দিয়ে যেতে যেতে খুব জানতে ইচ্ছে করছিল কতদিন আগে এখানে হিমবাহ ছিল। হয়ত কয়েকশ বছর আগেই এপথে বয়ে যেত হিমবাহেরা যারা এখন দূরে স্বর্গরোহিণী শৃঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। সম্প্রতিক গবেষণা মতে প্রতি বছর ৮ বিলিয়ন টন করে বরফ গলে যাচ্ছে হিমালয় থেকে যেগুলো আর পূরণ হচ্ছে না। গত ১৬-১৭ বছর নাকি প্রতিটা হিমবাহ গড়ে ৪৬ সেন্টিমিটার/প্রতি বছর করে পিছিয়ে গেছে। হিমালয়ে অবস্থিত হিমবাহবৃন্দের দয়ায় ভারত সুজলা সুফলা, তাদের

অবর্তমানে পরিস্থিতি কি হবে তা ভাবতেও ভয় করে । হিমবাহ অধ্যুষিত অংশে হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল করলাম উপত্যকাটা এখন সুন্দর U আকৃতি নিয়েছে । তারই মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে রুইনসারা নদী । নদীর ওপর পাড়ে ধ্বসের ফলে পাহাড়ের ঢাল থেকে মাটি সরে গিয়ে শিলার গঠন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে । অনেকগুলো V আকৃতির শিলাস্তর পরপর জুড়ে একে অপরের ওপর যেন ঢলে পরে অনেকটা শেভরণ (Chevron fold) ভাঁজের মত লাগছে ।

তালুকা

পৃথিবীর এই নবীনতম পর্বত কয়েকশ মিলিয়ান বছর ধরে বহু ঝাঁকুনি সহ্য করেছে, সেই রকমই কয়েকটা ভূ-আন্দোলনের ফলেই নিশ্চই হিমালয়ের এই অংশটার সৃষ্টি ।

নীল ঘাগরা পরিহিত সুপিন

এখান থেকে বাঁ দিকে ঘুরতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভূর্জপত্র গাছ (সিলভার বার্চ) । আলপাইন শ্রেণীর এই গাছ ভারী অদ্ভূত, যে ঠান্ডায় অন্য কোন গাছ হতে পারেনা, সেখানে ভূর্জপত্রের গাছ প্রায় ১৫,০০০ ফুট উচ্চতা অবধি বেঁচে থাকতে পারে । সেই কারণেই হয়ত প্রাচীন কালে মুনি ঋষিরা এই গাছের ছালকে লেখার জন্যে উপযুক্ত মনে করেছিলেন । ভুর্জপত্রের বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সুমিতদা বললেন এসব গাছকে আমরা আর কদর করিনা বলে পড়াশুনার মান এত কমে যাচ্ছে । সুমিতদা অতি সহজ করে এরকম এক একটা কথা বলে; দেন যার কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ খুবই গভীর ।

দেবসু বুগিয়ালে একটু বিশ্রাম

একটা দুটো করে পাথর ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে এবার বেশ সময় লাগছে । এতক্ষণ উচ্চতাকে তেমন পাত্তা দিইনি, আমরা কিছু না হলেও ১০,০০০ ফুটের ওপর দিয়ে হাঁটছি, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কম তাই অপেক্ষাকৃত সহজ পথটুকু পেরোতেও সময় লাগছে । এমন সময় দেখি দূরে একটা পাথরের ওপর বসে রামসিংজী আমায় ইশারা করছেন বামদিকের রাস্তা ধরতে — আর একটু হলে বালি পাস যাবার রাস্তায় হাঁটা দিচ্ছিলাম আরকি ! তখন ঘড়িতে ১০.৩০ টা । নিজেদের পারফরমেন্সের নিজেরাই অবাক । একে অপরের পিঠ চাপড়ে বাকি আধঘন্টা বেশ দুলকি চালে হেঁটে পৌঁছে গেলাম আমাদের বহু আকাঙ্খিত গন্তব্যে । ৭ই অক্টোবর ২০১৯ আমার প্রথম ট্রেকিং গন্তব্যে পৌঁছানো অবশেষে সত্যি সম্ভব হল । মেঘে ঢেকে আছে চারদিক । রণো আর বরুণ টুক করে ঘুরে এলো লেকের ধার ।

রুইনসারা তালের তীরে হিমবাহের তৈরী সুন্দর এক উপত্যকার মধ্যে আমাদের তাঁবু ফেলা হল । ঠান্ডায় জমে যাওয়ার আগেই রামসিংজী চটজলদি কাঠ জ্বেলে আগুনের ব্যবস্থা করলেন । আমরা আগুনকে ঘিরে বসে এই যাত্রাপথ

কালানাগ দর্শণ

রয়েনবসেরা

হিমবাহ উপত্যকা

এবং তারও আগের গত একবছরের পরিকল্পনার রোমন্থন করতে লাগলাম। এ এক অবর্ণনীয় তৃপ্তি।

অচেনা অজেনা ৯ জন মানুষ পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে এসে এক অভিযান সফল করলো সুষ্ঠ ভাবে। কোথাও কোন মনোমালিন্য হলো না, একবার ও মতান্তর হলোনা — সবাই যেন এক সুরে বাঁধা।

এই রোমান্টিকতা বেশিক্ষণ উপভোগ করার আগেই চারদিক থেকে মেঘ এসে ঢেকে দিল আমাদের — ঝেঁপে বৃষ্টি এল রুইনসারা উপত্যকায়। বৃষ্টি কমলে সেদিনের লাঞ্চ — গরম পোলাও। আহা! সে অমৃতের স্বাদ ভোলার নয়। ঝিরঝির বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তাঁবুতে ফিরে একরাশ ঘুম নেমে এল দুচোখের পাতা জুড়ে। একটু দিবানিদ্রা যাব, আর কি উপায় আছে! স্বাতী তখনই বিশ্বসংসারের যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। প্রথমে হুঁ হাঁ করে অর্ধনেত্র হয়ে উত্তর দিলেও পরক্ষণে মনে হল এমন দুপুর কি জীবনে আর ফিরে পাবো। হিমালয়ের বারোহাজার ফুটের ওপরে তাঁবুর মধ্যে বসে আমরা দুই প্রাণের সখী। মুহূর্তে ঘুম উধাও হল।

বৃষ্টি, শিলপড়া সব কমে গিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ ঝকঝকে আকাশ। বহুকষ্টে স্লিপিংব্যাগ থেকে বেরিয়ে দেখি আশেপাশের বরফাবৃত শিখরগুলো পড়ন্ত রোদে ঝলমল করছে। গুটি গুটি পায়ে চললাম রুইনসারা তাল দর্শনে। এই লেক মোটেও 'পেহেলে দর্শনধারী' নয়। টলটলে নীল জল আর তার মধ্যে আকাশচুম্বী বরফাবৃত শিখরের ছায়া, যেমন সব ছবিতে (বিশেষ করে সেলফিতে) দেখা যায় আরকি, তেমন মোটেও নয়। বরং আপাতঃ সাধারণ, সামান্য জলযুক্ত হালকা সবুজ রং এর লেক। পুকুর বললেও অত্যুক্তি করা হবে। আর দর্শন বাদ দিয়ে যদি গুণের কথা ভাবো, তাহলে প্রকৃতির এক অসাধারণ সৃষ্টি। মূলত হিমবাহের ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট ১২,০০০ উচ্চতায় অবস্থিত এক জলাশয় যার থেকে একটা শীর্ণকায়া নদীর উৎস। এই নদীই ক্রমশ ঃ আশে পাশের ঝর্ণার জলে পুষ্ট হয়ে বড় নদীর আরার নেবে। আর লেকের চারদিক ঘিরে রয়েছে বরফাবৃত শিখর। এই বিশালতার সামনে আমরা সবাই নগণ্য, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জীব। জীবনের ছোট বড় চাওয়া পাওয়া, জিবীকা — কীর্তি সব তুচ্ছ।

ঠান্ডার চোটে সবাই চললাম কিচেন টেন্টে, ওটাই আজ সব থেকে গরম জায়গা। সেদিনের সন্ধ্যা মাতিয়ে দিল প্রথমে শ্রেয়সী ওর অসাধারণ গান দিয়ে, তারপর এক এক করে বরুণ, স্বাতী, অভিজিতদা। ওস্তাদের মার শেষ রাতে তাই রামসিংজীর অসামান্য গাড়োয়ালি গান দিয়ে শেষ হল আমাদের সঙ্গীতমূখর সন্ধ্যা। সেদিন রাতে হঠাৎ প্রচন্ড ঠক

ঠক আওয়াজে জেগে গেলাম । একটু সজাগ হতে বুঝলাম ওটা আমার নিজের কাঁপুনির আওয়াজ । নিজেই মনে মনে একটু হেসে নিলাম । এই যে বলি ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছি সেটা মোটাও প্রতীকি নয় ।

রুইনসারা তাল

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো পূবদিক কোনদিকে সেই আলোচনা শুনে । তাঁবুর বাইরে অভিজিতদা, আশীষদা এবং সুমিতদা প্রথম কিরণ ধরার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বুঝতে সময় লাগলোনা । বেরিয়ে পা দিতেই বুঝলাম ঘাসপাতা সব জমে বরফ হয়ে আছে । ব্রাশ করতে করতে জলের খোঁজে কিচেনের সামনে গিয়ে দেখি জলের পাত্রটায় কয়েক ইঞ্চি বরফ জমে আছে । এদিকে মুখ তো তখন আমায় ধুতেই হবে । পাশে রাখা মগটা দিয়ে বরফ ভেঙ্গে কোনরকমে মুখ ধুলাম । দাঁতগুলো তা সহ্যও করে নিল, কিন্তু সইতে পারল না আমার দুহাতের আঙুলগুলো । জ্বালাপোড়া করা দুই হাত নিয়ে জুতো খোলারও ক্ষমতা নেই । অবশেষে স্বাতীর যত্নে কিছুটা সাড় ফিরে পেলাম ।

ঠান্ডায় জমে যাওয়া ৯ জনকে সেদিন মুমচাঁদ আখরোট দেওয়া সুস্বাদু ডালিয়া খাওয়ালো ব্রেকফাস্টে । তারপর রামসিংজী সবাইকে রুইনসারা তাল মাতার মন্দিরে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠা ভরে পূজা দিলেন । প্রসাদ মাথায় ছুঁইয়ে তাল পরিদর্শন করে এবারের মত আমরা ফেরার পথ ধরলাম ।

পুনশ্চঃ একই পথে ফিরেছি আমরা সেদিন রয়েনবসেরা । সুপিন সাথে ছিল এবারও । রাতে নদীর ধারে বৈঠকও বাদ যায়নি । যেটা যোগ হয়েছিল তা হল চাঁদের আলোয় রূপালী সুপিনকে দেখে রণোর কাব্যিক উক্তি ‘বয়ে যাওয়া নদী যেন ডালিয়ার ভান্ডার’ — বেচারার ক্ষিদের জ্বালা আর সকালের ডালিয়ার স্বাদ সব মিলে মিশে এক ‘সুকান্ত’ ভাবাগ্রস্থ হয়েছিল । সীমাতে ফিরেছি আমরা ওসলা গ্রাম হয়ে । তার গল্প আজ নয়, অন্য কোনদিন করবো । অবসন্ন দেহ নিয়ে তালুকা গ্রামেও ফিরেছি সবাই সুস্থ শরীরে । সাঁকরিতে ফেরার আগে জিপের বাইরে বেরিয়ে থাকা এক লোহার খোঁচায় বুঝতে পারলাম সভ্যতার গুঁতো খাবার দিন ফিরে এলো ।

ফটোগ্রাফি ঃ অভিজিৎ কর গুপ্ত এবং মনীশ সেনগুপ্ত

অন্যান্য তথ্য ঃ দিল্লী থেকে রুইনসারা তাল ট্রেক করে দিল্লী ফিরতে আমাদের লেগেছে ১০ দিন । দিল্লী থেকে দেরাদুন এক্সপ্রেস করে দেরাদুন ৬ ঘন্টার যাত্রা । সেখানে স্টেশনের থেকে হাঁটা দূরত্বে বহু সুলভ হোটেল আছে রাতটুকু কাটানোর জন্যে । দেরাদুন থেকে সাঁকরি বাস আছে বা ছোট গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় — ২০০ কিলোমিটার রাস্তা, যেতে লাগে প্রায় ৮ ঘন্টা । সাঁকরিতে কয়েকটা হোটেল এবং লজ আছে তবে আগে যোগাযোগ করে যাওয়া ভালো ।

স্মৃতি ভদ্র

রসুইঘরের রোয়াক

বহুবছরি অশ্বত্থের অবিচল ছায়া পেরিয়ে, দু'পাশে বেগুনি জারুল, হলুদ সোনালু, লাল কৃষ্ণচূড়ার মায়ায় মধ্যমণি হয়ে হেঁটে যাওয়া হয়নি অনেকদিন।

আকন্দ, ভাঁটফুল বা ফণিমনসা'র ছোট্ট লাল ফুলেও সেজে উঠিনি অনেকদিন। হিজলের বন, ভেজা কদমের তলা, ঝিঙ্গের মাচায় সাদা ফুল সেই কবে হাত ফসকে হারিয়ে গেছে!

নিকানো তুলসীতলায় জাফরানি বোঁটার শিশিরজল মাখা শিউলির অর্ঘ্য, উঠোনের কোণে সাদা টগরের পেলব সময় আর শ্বেতকাঞ্চনের নিভৃত ভোর, সে কি এই জনমের গল্প ?

হ্যাঁ, সে তো এ জনমেরই গল্প। এই তো সেদিনের গল্প।

বাবা শহরে বদলী হয়ে যাবার আগে আমরা বাড়িতেই থাকতাম। এক উঠোনের আর এক উনুনের ছিল সে বাড়ি।

সে বাড়ির উঠোন তখনো টুকরো টুকরো হয়নি। বড় উঠোনের চারপাশ ঘিরে থাকা ঘরগুলো তখনো আমার তোমার নামে ভাগ হয়নি।

ঠাকুমার ঘরকে ডাকা হতো বড়ঘর। বলতে গেলে সারাদিন এমনকি রাতে ঘুমাতে যাবার আগ পর্যন্ত সে ঘরেই সকলে মিলে হৈ চৈ, আড্ডা, আলোচনা, পরামর্শ সব হতো।

সে বড়ঘরের দরজাগুলো কাঠের নকশী করা। আর জানালাগুলোও ছিল বড় আর কাঠের পাল্লায় নকশা করা। তবে জানালায় কোনো লোহার শিক ছিলনা।

সেই শিকবিহীন ফাঁকা জানালাকে দরজা বানিয়েই আমি দিনরাত এপাড় ওপাড় হতাম।

সেসব সময়ে ঠাকুমার দিন শুরু হতো সূর্যের আলো মাটিতে আসার আগেই।

আমাদের বাইরবাড়িতে ছিল শ্বেতকাঞ্চন আর কাঠটগরের ঝাড়। ঘুম থেকে উঠেই একটি চাটাইয়ের বানানো সাজি নিয়ে আমি ছুটতাম ঠাকুমার পিছু পিছু 'ও ঠাকুমা ওই ফুলটা নাও, ও ঠাকুমা এই ফুলটা নাও, ও ঠাকুমা আজ তো লাল ফুল পেলে না।'

একটি একটি করে আমার দেখিয়ে দেওয়া ফুল যত্নে তুলে সাজি ভরে ঠাকুমা বলতো, 'চৈতন্য ঠাকুর সাদা ফুলই ভালবাসে।'

ফুল তুলে, বাসি ঘর মুছে স্নান সেরে ঠাকুমা যখন নাকে কপালে তিলক পড়তো, ততক্ষণে সূর্যের নরম আলো আলগোছে ছুঁয়ে দিয়েছে পেয়ারা গাছের মাথা।

ঠাকুমার পূজা শেষ হবার অপেক্ষা। মা কাকিমারা সব বাসি কাজ সেরে স্নান করে রান্নাঘরের উনুনে আগুন দেবার যোগার করেছে।

এরমধ্যেই মা ডেকে উঠতেন, 'মনি পড়তে বসো।'

কীভাবে পড়তে বসি? বাতাসা প্রসাদ খাওয়াই তো হয়নি। বই ধরলেই প্রসাদ নেবার আগে আবার হাত ধুতে হবে।

আমি আগে থেকেই হাত ধুয়ে ঠাকুমার পেছনে বসে থাকা অবস্থায়ই উত্তর দিতাম, পুজা শেষ হয়নি মা।

ঠাকুমার পুজার ঘন্টার শব্দের সাথে তখন জুড়ে যেতো আরেকশব্দ। দাদুর রেডিও তখন গাইছে, 'জাত গেলো জাত গেলো বলে একি আজব কারখানা।'

সকালের বেশ রয়েসয়ে শব্দ করার ব্যাপারটি তখন কলরবে গিয়ে ঠেকেছে। কেউ কলেজে যাবে, কেউ অফিসে। কলপাড়ের সিরিয়ালও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে তখন।

কিন্তু রান্নাঘরের উনুনে আগুন পড়েনি। ঠাকুমা পূজাটুকু খুব তাড়াহুড়ো করে শেষ করতো। পূজা শেষে দু'টুকরো বাতাসা আর একটি তুলসীপাতা আমার হাতে দিয়ে বলতো, নমঃ করে খাও।

এরপর ঠাকুমা এক মুহূর্ত দাঁড়াতো না। উপরের ঘর থেকে একটি এলুমিনিয়ামের গামলায় চাল নিয়ে ছুটতো রান্নাঘরে, তখন আমি হাতের বাতাসায় একটু একটু করে খাচ্ছি তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবার ভয়ে।

সকালে রান্নাঘর সবার আগে হতো চা। মুড়ি, মুড়কি দিয়ে সে চা সবার খাওয়া শেষ হবার আগেই উনুনে বলক উঠতো ভাতে। ভাতের হাড়ির ঢাকনা আলগা করে ঠাকুমা যেতো সবজী বাগানে।

বড়ঘর আর রান্নাঘরের কোণায় ছিল সে বাগান। বড়ঘরের দাদুর কাছে 'পাখিসব করে রব, রাত্রি পোহাইলো' পড়তে পড়তে জানালা দিয়ে দেখতাম মাচা থেকে বেছে বেছে কচি চালকুমড়োটা নিচ্ছে ঠাকুমা।

সেই চালকুমড়োতেই হতো কুমড়ো বেশ্বরী।

ঠাকুমা যখন কুমড়ো কুচানো শেষে ভাতের হাড়ি উপুড় দিয়েছে মাড় গালতে, তখন আমি পড়া শেষ করে দাদুর চায়ের খালি কাপটি নিয়ে পৌঁছে গেছি রান্নাঘরে।

উনুনে লোহাড় কড়াই চাপিয়ে ঠাকুমা নিজের ভাগের মুড়ি মুড়কি আমাকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতো – খাও, আজ সকালের রান্নায় বেলা গেলো, দিদি।

আমি বাটি থেকে বেছে বেছে মুরকি খেতে খেতে দেখতাম, সর্ষের তেল তেতে ওঠা কড়াইয়ে দিতেই ধোঁয়া উঠছে। এরপর সঙ্গে সঙ্গেই কালোজিড়া আর কাঁচামরিচ পড়তো কড়াইয়ে। একটু নেড়েচেড়ে তাতে কুচানো চালকুমড় নেড়েচেড়ে ঢাকা দিতো ঠাকুমা।

এরমধ্যে উপুড় করা ভাতের হাড়ি তুলে ন্যাকড়া দিয়ে তার গা মুছে নিতো ঠাকুমা। ওদিকে মা পাটায় সর্ষে, কাঁচামরিচ আর লবণ মিশিয়ে বাটতে শুরু করেছে।

কুমড়ো বেশ্বরী

ঠাকুমা বলতো, সর্ষে বাটা চন্দনের মতো মিহি না হলে তরকারির স্বাদ হয়না।

ঠাকুমা কড়াইয়ে ঢাকনা তুলে এবার লবণ দেয়, সাথে অল্প হলুদ। ঠাকুমা যে কোনো সর্ষে বাটার তরকারিতেই হলুদ কম দিতো। এরপর আরেকটু নেড়েচেড়ে আবার ঢাকা দিতেন। ততক্ষণে মা'র সর্ষে বাটা হয়ে গেছে। ঠাকুমা সারি সারি করে কাঁসার থালা সাজিয়ে নিয়েছেন ভাত বাড়বে বলে।

ওদিকে ঢাকনার ফাঁক ফোকড় দিয়ে বেরিয়ে আসা ভাপের ঘ্রাণে আন্দাজ করে ঠাকুমা ঢাকনা খুলে চালকুমড়োয় চন্দনের মতো মিহি সর্ষে বাটা মেশায়। এরপর খুব অল্প সময় ঠাকুমা উনুনে রাখতো কড়াইটি। দ্রুত অল্প একটু চিনি ছিটিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিতো।

সারি সারি কাঁসার থালে গরম ভাত আর ধোঁয়া ওঠা কুমড়ো বেশ্বরী যখন রান্নাঘরের বারান্দায় গিয়ে পড়তো, রাশিয়া থেকে কাকুর পাঠানো ঘড়িটি ঢং ঢং করে বেজে জানিয়ে দিতো তখন সকাল আট'টা।

আমাদের বাড়ির পেয়ারা গাছটা ছিল একদম মাঝ উঠোনে।

মাঝ উঠোনের সে পেয়ারা গাছের ছায়া এঘর ওঘর করতো অবলীলায়। আর সেই ছায়া মেপেই ঠাকুমা বলতো, বাজার আসার সময় হয়ে গেলো সকালের খাবারের পাট মিটলো না, তাড়াতাড়ি করো তোমরা।

স্কুল শিক্ষক দাদু তখন বাজার করে পাঠিয়ে দিতেন কোনো রিক্সাচালকের হাতে। 'বাবু বাজার পাঠাইছে' এই হাঁকেই ঠাকুমার মাটির উনুনে নতুন করে আগুন পড়তো। বাজারের ব্যাগ থেকে যতই নিত্য নতুন সবজি বের হোক না কেন ঠাকুমার বাগান থেকে হয় মান কচু না হয় মিষ্টি কুমড়ো এসে ঠিকই জুটতো রান্নাঘরে।

তিল কুমড়ো

আর মিষ্টি কুমড়ো মানেই তিল কুমড়ো। গরমের দিন হলে তো মৌরী ফোড়নে মাসকলাই-এর ডাল এরসাথে অবশ্যম্ভাবী।

ঠাকুমার রান্নাঘরে আমি কখনো আমিষ নিরামিষের আলাদা উনুন দেখিনি। একই উনুনে আমিষ নিরামিষ দু'পদই হতো। শুধু নিরামিষ পদ রান্নার আগে ঠাকুমা উনুন জল মাটি দিয়ে একবার লেপে নিতো। ঠাকুমা বলতো, আগুনে দোষ নেই।

স্নান শেষে সিঁদুর দিয়ে ঠাকুমা যখন উনুনে আগুন দিতো ততক্ষণে মা-কাকিরা সবজি মাছ কেটেকুটে রান্নাঘরের বারান্দায় গুছিয়ে রেখেছে। তবে কুমড়োটি ঠাকুমা নিজ হাতে কাঁটতো। বলতো, ডুমো সব একমাপের না হলে স্বাদ কমে যায়।

সব রান্না শেষে উনুনে উঠতো তিল কুমড়ো। কড়াইয়ে সেসব দিন সর্ষের তেল পড়তো। এরপর শুকনো মরিচ আর কালোজিড়ে। খোন্তায় নেড়ে নেড়ে সে ফোড়নের ঘ্রাণ তেলে মেশাতো ঠাকুমা।

এরপর ডুমো করা কুমড়ো। ফোড়নের তেলে কুমড়োর তখন আরোও রঙ খুলতো। একটু লবণ হলুদ পড়তেই কুমড়ো ভাজার ঘ্রাণ রান্নাঘরের সকল আমিষ পদকে পেছনে ফেলার ইঙ্গিত দিতো। এরপর কয়েকটা কাঁচামরিচ আর একটু জল ছিটিয়ে এলুমিনিয়ামের থালে ঢাকা পড়তো কুমড়ো। থালার ফাঁক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসা ভাপে ঠাকুমা আন্দাজ করতো কুমড়ো সেদ্ধ হলো কিনা। এরপর থালা তুলে তিল ছিটিয়ে নামিয়ে ফেলতো তিল কুমড়ো।

পেয়ারা গাছের ছায়া তখন বড় ঘরের চাল ছেড়ে রান্নাঘরের বারান্দায়।

মায়ের ডাক, মনি স্নান করে নে, দাদু টিফিনে চলে আসবে। স্কুল, বাড়ির কাছে হওয়ায় দাদু টিফিনে চলে আসতেন। স্নান শেষে আহ্নিক সেরে বড়ঘরের বারান্দায় পিড়ি পেতে দাদু আমায় ডাকতেন, গিন্নি চলে আসো।

দাদুর পাতে হালকা লালচালের ভাতের পাশে মানকচু সেদ্ধ, পুইশাকের চচ্চড়ি আর তিল কুমড়ো। আর আমার পাতে পুইশাকের চচ্চড়ি আর তিল কুমড়ো। কাঁচামরিচে মাখা মানকচু সেদ্ধর বায়না ধরতেই ঠাকুমা বলতো, ওগুলো পথ্য, দাদুর মুখে রুচি ফেরানোর জন্য। তুমি তিল কুমড়া খাও। দেখো কত মিঠা।

আমি ঠাকুমার ন্যাওটা নাতনি। পাতের কুমড়োগুলো একে একে খেয়ে বলতাম, খুব মিঠা, আরেকটু দাও।

মিঠা তিল কুমড়ো খেতে খেতেই দুপুরের রোদ কিছুটা মিইয়ে আসতো। আর চলে আসতো ভাতঘুমের সময়।

সেসব দিনে দুপুরের ভাতঘুম মানেই ঠাকুমার পেট জড়িয়ে শুয়ে থাকা। আর দাদুর রেডিও-তে অনুরোধের আসর।

দুপুরের পাট চুকিয়ে রান্নাঘর লেপেমুছে, গা ধুয়ে ঠাকুমা বড়ঘরে আসতেই আমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো মেঝেয় পাটি বিছাতাম। এরপর ফুলতোলা কভারের বালিশ দু'টো পাশাপাশি রেখে না ঘুমানোর শর্ত ছুড়ে দিয়ে ঠাকুমাকে বলতাম, আমি ঘুমাবো না, শুধু শেফালি ফুল বালিশে শুয়ে থাকবো।

ঠাকুমার কাছেই শিখেছিলাম শিউলি ফুলের আরেকনাম শেফালি ফুল।

বালিশের ভাগবন্টন শেষে হাকিমপুরী জর্দায় পান মুখে দিয়ে ঠাকুমা যতক্ষণে আমার কাছে আসতেন ততক্ষণে দাদুর রেডিও গাইতে শুরু করেছে 'আমি ধন্য হয়েছি ওগো ধন্য, তোমারি প্রেমেরই জন্য'।

শেফালি বালিশ, হাকিমপুরি জর্দার ঘ্রাণ, মাথার উপরে সিলিং ফ্যানের ঘটাং ঘটাং, ধন্য হয়েছি আমি ধন্য – সবকিছু কীভাবে যেন সব শর্ত ভঙ্গ করে আমাকে আস্তে আস্তে তন্দ্রায় তলিয়ে দিতো।

সে তন্দ্রা একটু গাঢ় হতেই দেখতাম শুক্লা, ইতু আর আমি দেবদারু গাছের নীচে রান্নাবাটি খেলতে খেলতেই দেবদারুর ফল নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করেছি। আমি যতই ওদের হাত থেকে আমার ভাগের ফল কেড়ে নিতে চাই, পারিনা।

স্বপ্নে কেন যেন জেতাই যায় না।

আমাকে স্বপ্নে রেখেই ঠাকুমা উঠে পড়তো। ভাদ্র মাসেই তখন দুর্গাপূজার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত। ততদিনে জমি থেকে চলে এসেছে আমন ধান ।

আমাদের বাড়ির বড়ঘরটি ছিল টিনের দোতালা। উপরের ঘরে থাকতো বড় বড় কাঠের বাক্স আর মাটির বড় ডোলা (এক ধরণের হাড়ি)। সেসব ডোলায় ভরা থাকতো চাল আর বিভিন্ন রকমের শস্য।

কাদম্বিনী, ঝিঙেশাইল, নাজিরশাইল, দীঘা'গালভরা নাম ছিল সেসব চালের। ঠাকুমা থামা ভরে দীঘা ধানের চাল নিয়ে কাঠের সিড়ি দিয়ে নামতেই ফুরিয়ে যেত আমার ভাতঘুম। মুড়ি ভাজার প্রস্তুতি নিতে মা তখন খোলা রান্নাঘরে।

চারপাশ খোলা শুধু মাথার উপরে টিনের চাল দেওয়া রান্নাঘরটা ছিলই মুড়ি, খৈ, ঢ্যাপের মোয়া, তিলের কটকটি, নারিকেলের নারু বানাবার জন্য।

তাই খোলা রান্নাঘরের উনুনে আগুন পড়লেই আমি উৎসবের গন্ধ পেয়ে যেতাম।

ঠাকুমা দীঘা ধানের চাল নিয়ে খোলা রান্নাঘরে পৌঁছাতেই পিছে পিছে আমিও আমিও হাজির হতাম । ঠাকুমার তাড়ায় হৈ হৈ করে শুরু হয়ে যেত মুড়ি ভাজা।

মা-কাকিমারা মিলে উনুনের ভাঙা মাটির খোলায় চাল, নুনজল ছেটাতো ফুট ফুট করে চাল ফুটে ওঠার জন্য। চাল ফুটতে শুরু করলেই ভাঙা হাড়ির চাল নিয়ে ঠাকুমা ফেলতো গরম বালুর হাড়িতে। নেড়েচেড়ে বালুসহ লাল ছোটোছোটো মুড়ি গিয়ে পড়তো মাটির ঝাঁঝড়ে।

বালু থেকে মুড়ি আলাদা হতেই কাঁসার জামবাটিতে মুড়ি পড়তো আমার জন্য। গরম মুড়িতে কয়েক ফোটা সর্ষের তেল ফেলে মাখিয়ে ঠাকুমা আমার দিকে বাড়িয়ে বলতো, ছোটপিসিকে বলো গুড় দিতে।

গরম দীঘা ধানের তেলে মাখানো মুড়ি আর গুড় ফেলেছেড়ে খেতেখেতেই সন্ধ্যা গড়িয়ে যেতো।

আর খৈ, মুড়ি ভাজার পর সাধারণত রাতের খাবারে ঠাকুমা বেছে নিতো এই চালেডালে, খুব অল্প সময়ে রান্না হতো বলে।

চালেডালে রান্না হতো কিন্তু সেই খোলা রান্নাঘরেই। মুড়ি ভাজা শেষে বেঁচে যাওয়া উনুনের আগুনে।

ঝিঙ্গেশাইল চাল আর খোসাসুদ্ধ মাসকলাই ডালে বানাতো হতো এই চালেডালে।

পেতলের খাবড়িতে তেল গরম হলেই অল্প জিরা দিয়ে নেড়েচেড়ে চাল আর ডাল দিয়ে দিতো ঠাকুমা। এরপর হলুদ আর লবণ। অল্প নেড়েই কয়েকটা কাঁচামরিচ আর গরম জল। ঠাকুমা অপেক্ষা করতো চালডালের ভাল করে ফুটে ওঠার। এরপর ফুটে চালডাল নরম আর ঘন হয়ে আসতেই বেশ খানিকটা ছেঁচা আদা আর অল্প গরম জল দিয়েই প্রথম ঢাকনা পড়তো চালেডালের খাবড়িতে।

চালডালের

চালেডালের ঘ্রাণ তখন পূজা পূজা একটা গন্ধ নিয়ে বাতাসে ঘুরে বেড়াতো।

উনুনের ঢিমে আঁচে ঠাকুমার কপালের সিঁদুরের টিপ ততক্ষণে ঘেমে গলে নেমে এসেছে নাকের কাছে। আমি হাত দিয়ে মুছে দিতে গেলেই ঠাকুমা বলে উঠতো, তুমি আমার সত্যিকারের দিদি।

ওদিকে চালেডালে ঘন হয়ে ফুটে উনুনের চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এরপর নামানোর পালা। উনুন থেকে আগে কয়েকটা

শুকনো মরিচ আর তেজপাতা ফোড়নের ছ্যাঁত করে ওঠা শব্দের সাথেসাথেই রান্নাঘরের বারান্দায় সকলের পিড়ি পড়ে যেত।

আর আমি ছোটপিসির তেলে ভাজা কাঁচা বাদাম আর লেবুর রস ছড়ানো নরম চালেডালে মুখে দিতেই দাদুর রেডিও থেকে ভেসে আসতো,

"আপনারা শুনছেন ভয়েস অফ অ্যামেরিকা। শুরু করছি রাত দশটার সংবাদ। রাস্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে ঢাকা ....."

ঠাকুমার পুজার বাসনগুলো ছিল পেতলের। পুজা শেষে উঠোনে তেতুল আর মাটি দিয়ে সেগুলো মাজা হতো। এই কাজটি বেশিরভাগ সময় করতো বৌমারা।

আমাদের বাড়িটি যত বড় ছিল মানুষ ছিল তারচেয়ে ঢেড় বেশী।

বাবা, কাকা, পিসি, বৌমারা মিলে প্রায় সতের আঠারোজন মানুষ বাড়ির আনাচকানাচ ভরে রাখতো। বড় বড় সেসব মানুষের ভিড়ে আমিই একমাত্র ছোট মানুষ। আর প্রচন্ড অনুকরণ প্রিয় ছোট মানুষ।

মা বলে, কারো আচরণ বা মানুষের কোনো শারিরীক বৈশিষ্ট্য একবার দেখেই হুবহু সেভাবেই করে দেখাতাম। আর এই অনুকরণ থেকে বাদ যেতো না ডাকও।

ঠাকুমা তাঁর ছেলের বৌদের বৌমা ডাকতো আমিও কেন বাদ যাবো। মা-কাকি সব আমার বৌমা। তবে মাকে মা ডাক ফিরিয়ে দিলেও কাকিরা এখনো আমার বৌমা।

বৌমাদের ধোয়া পেতলের বাসন বড়ঘরের লাল বারান্দায় উপুড় হতো। সে বাসন থেকে চুঁইয়ে আসা জলে আমি আঙুল দিয়ে আল্পনা আঁকা শুরু করতেই দরজায় হাঁক পড়তো বাজার আসার।

আর লাল বারান্দায় জলের আল্পনাতে ফুলের শেষ পাপড়িটা আঁকার আগেই উঠোনে থপ করে পড়তো বাজারের থলি।

বাজারের থলি থাকতো দু'টি। একটি সবজীর, আরেকটি মাছের।

সবজীর থলি সাথেসাথেই চলে যেতো রান্নাঘরের বারান্দায়। আর মাছের থলিটাকে একটি বড় এলুমিনিয়ামের গামলায় উপুড় করে ঢালা হতো মাছ উঠোনেই।

চকচকে নওলা মাছের গা লেপ্টে বেশ কয়েকটি চিংড়ি মাছ। ঠাকুমা বলতো ইচা মাছ।

আর ইচা মাছ মানেই কচুর পুরপুরি অবধারিত।

সেসব দিনে একই মাপের সব চিংড়ি মাছ পাওয়া যেত না। ছোটবড় মেশানো থাকতো। ঠাকুমার দেখিয়ে দেওয়া খুব ছোটছোট ইচা মাছ বৌমারা আলাদা করে রাখতো কচুর পুরপুরির জন্য।

এই কচুর পুরপুরি রান্না হতো সব রান্নার শেষে।

দুপুরের জন্য মানকচু সেদ্ধ, লালশাক ভাজি, মাছের মাথায় লাউয়ের ঘন্ট আর আলু-বেগুন কাঁচামরিচে নওলা মাছের ঝোলে শেষ বলক উঠতেই ঠাকুমার বাগানের কাবিল কচুর ডাটা এসে পড়তো রান্নাঘরে।

পাতাবাদে ডাটাগুলোর সবুজ আঁশ মা ছাড়াতে শুরু করতেই মেজো বৌমা বসে যেত আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা ডাল বাটতে। এই ভেজানো ডাল আবার হতো দু'রকম মেশানো ডাল। মুগ আর মোটরের ডাল সেটা।

আঁশ ছাড়িয়ে ডাটাগুলো সেদ্ধ বসাতেই দাদুর আহ্নিক শেষ হয়ে যেতো। বড়ঘরের বারান্দায় পিড়ি পেতে যতই ডাকুক, গিন্নি ও গিন্নি, আজ আমি যাবই না। আমার যে আজ ওই ডালের বড়া চাই ভাতের থালে।

আমাকে ছেড়েই দাদু বসে পড়তেন খেতে। রান্নাঘরে ততক্ষণে কচুর ডাটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। ডালবাটা শেষে সে শিলবাটাতেই বেছে রাখা ছোট ইচা মাছগুলো বাটতে শুরু করেছে মা।

কড়াইতে তেল দিয়ে ঠাকুমা পেতলের গামলায় কয়েক হাতা ভাত নিয়ে বড় ঘরের বারান্দায় যায়। ঠাকুমা বলতো, একবাড়া ভাত খেতে নেই। দাদুর ভাতের থালে আর অল্প একটু ভাত দিয়েই ঠাকুমা দৌড়ে আসতো রান্নাঘরে। মা ততক্ষণে ডালবাটা, ইচা মাছ বাটা, হলুদ আর লবণ মিশিয়ে রাখা কাঁসার বাটি উনুনের পাশে রেখে দিয়েছে।

ঠাকুমা হাতে সেই মেশানো বাটা নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে চ্যাপ্টা করে কড়াইয়ের গা ঘেঁষে ফেলে তেলে। ছ্যাঁত করে ওঠা শব্দ আর ধোয়ায় ছড়ানো ঘ্রাণে আমি বুঝতে পারি, দাদুর ডাক অগ্রাহ্য করা ঠিক হয়নি আমার।

আমার মুখ দেখে ঠাকুমা একটি গরম লাল করে ভাজা বড়া আমার দিকে বাড়িয়ে বলতেন, খিদা পাইছে দিদি?

বড়া ভাজা শেষে সেই তেলেই চার পাঁচটি ইচা মাছও ভেজে নেওয়া হতো। এরপর সে তেলেই জিড়া, তেজপাতা আর শুকনা মরিচ ফোড়ন পড়তো। ফোড়ন নেড়েচেড়ে কড়া গন্ধ ছড়ানো শুরু হতেই সেদ্ধ কচুর ডাটা পড়তো কড়াইয়ে। হলুদ আর লবণ দিয়ে মিশিয়ে অনেকগুলো কাঁচামরিচ দিয়ে ঢাকা পড়তো সেদ্ধ কচুর ডাটা।

ততক্ষণে বাড়ির প্রায় সকলের খাওয়া হয়ে গেছে।

শুধু ঠাকুমা আর বৌমারা বাদে। আর হ্যাঁ আমিও রান্নাঘরের কোণায় বসে অপেক্ষায় কচুর পুরপুরি রান্না শেষ হবার।

ঠাকুমা তাড়াহুড়ো করে ঢাকনা তুলে খুন্তি দিয়ে ঘেটে দেয় কচুর ডাটা। এতে ডাটাগুলো ভেঙেচুড়ে ঘন্ট হয়ে যায়। ঠাকুমা দেরী না করে ভেজে রাখা বড়া আর ইচা মাছগুলো ঘন্টে মিশিয়ে আবার একটু ঢাকা দেয়।

রান্নাঘরের বারান্দায় পিড়ি পড়ে।

ঠাকুমা বৌমাদের জন্য কাঁসার বেলনচিতে ভাত বাড়তে থাকে। ওদিকে ঢাকনার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা ভাপে ঠাকুমা বুঝে যায় পুরপুরি কড়াইতে হাল্কা লেগে এসেছে।

উনুন থেকে গনগনে আগুনে খড়ি বের করে ঠাকুমা আঁচ কমায়।

এরপর ঢাকনা তুলে অল্প চিনি ছড়িয়ে খুন্তা দিয়ে ভাজা বড়াগুলোও ঘেটে মিশিয়ে দেয় কচুর ডাটার সাথে।

কচুর পুরপুরি আমার থালে লোহার খন্তা থেকে খুব অল্প করে ফেলে, আলাদা করে রাখা ভাজা বড়া দিয়ে ঠাকুমা বলতো, তুমি পুরপুরি শেষ করো এটুকু, ফুরালে আবার দেবো।

আমি কচুর পুরপুরি আর ভাত রেখে বড়া কুড়মুড় করে খেতে খেতে দেখতাম, ঠাকুমা তাঁর থালে কচুর পুরপুরি ভাতে মেখে খেয়েই পেতলের ঘট থেকে ঢকঢক করে জল খাচ্ছে।

আর আমি সেই ঘটে খোদাই করে রাখা শব্দ বানান করে করে পড়ে নিতাম 'অ-রু-ণা বা-লা।'

তখন ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যেতো। পরীক্ষা নিয়ে আমার যতটুকু না চিন্তা থাকতো, তারচেয়ে বেশী চিন্তায় থাকতো মা। 'মনি, ওঠ ছয়টা বাজে। মনি, ব্রাশ করতে করতেই তো বেলা করে ফেললি, পড়বি কখন? মনি, এখনো পড়তে বসলি না?' বিরক্তির একশেষ।

এই বার্ষিক পরীক্ষার জন্যই অগ্রহায়ণের নগরকীর্তন দেখতে পাইনি আমি কোনো দিন।

তবে শেষ পরীক্ষার দিনটি ছিল খুব আনন্দের। এর পরদিনই তো আমরা বাড়িতে যাবো। তখন ভাড়া বাড়িকে আমরা বাসা বলতাম।

আমাদের কাছে বাড়ি মানে ছিল বাসট্যান্ডে দাঁড়ানো প্রাচীন বটগাছ, রূপবানী সিনেমা হলে টানানো ব্যানারে রোজিনার গালের তিল, কালী মন্দিরের সামনে ঋষিপাড়া আর হাকিমপুরী জর্দার ঘ্রাণ মেখে দাঁড়িয়ে থাকা ঠাকুমা।

বয়সের ভার তখনো ঠাকুমাকে কমজোর করেনি। বাড়ি পৌঁছাতেই তাঁর প্যান্ডোরার বাক্স থেকে বেরিয়ে আসতো ঢ্যাপের মোয়া, তিলের কটকটি, নারিকেলের নারু। আর সন্ধ্যা হলেই গুড়ের চা।

এই চায়ের প্রতি ছিল আমার অদম্য আকর্ষণ। মা কখনো আমাকে চা খেতে দিতো না। বলতো, 'মনি, চা খেলে লিভার নষ্ট হয়ে যায়'। একমাত্র ঠাকুমাই স্বাস্থ্যবিধির সব সতর্কতা উপেক্ষা করে প্রতি সন্ধ্যায় আমাকে এক কাপ গুড়ের চা দিতো।

তাই সন্ধ্যা হলেই পিড়ি নিয়ে বসে পড়তাম রান্নাঘরের মেঝেয়। শীতের সন্ধ্যায় গায়ে ঠাকুমারই একটি চাদর জড়িয়ে দেখতাম, পিতলের খাবড়িতে কাঁসার ডাবর হাতা দিয়ে নেড়েনেড়ে দুধ জ্বালানো শেষে জলভরা সসপ্যান বসতো আগুনে। এরপর তাতে থেঁতো করা আদা। জল টগবগ করে ফুটলে তাতে পড়তো গুড়ো চা। জলের রঙ বদলায়। লাল, কালচে লাল, খয়েরি এরপর সেই পেতলের খাবড়ি থেকে ডাবর হাতায় ভরে দুধ পড়তো চায়ে। ততক্ষণে চায়ের ঘ্রাণ রান্নাঘর ছাপিয়ে উঠোনের কুয়াশায় জমাট বেঁধেছে।

আমি ঠাকুমার মুখ দেখি। কাজের ক্লান্তি নেই, শেষবেলায় গা ধুয়ে পড়া মাড়হীন শাড়িতে ঘোমটা টেনে নেয় আরেকটু।

এরপর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। টগবগ করে ফুটতে থাকা চায়ে ঠাকুমা মেশান খেজুরের গুড়। নরম সেই গুড়কে আমরা বলতাম ঝোলা গুড়।

গুড়ের চায়ের ঘ্রাণ তখন এ বাড়ির উঠোন ছাপিয়ে পড়শির ঘরে।

চায়ের কাপ আর সকালের বাড়তি ত্রিভুজ পরোটা আমার দিকে বাড়িয়ে ঠাকুমা বলতো, 'গুড় আদার চা-এ ঠান্ডা কাশি সারে।'

আমাদের বাড়ির ডালিম গাছে তখন ফুল এসেছে। লাল লাল ফুলগুলো সবুজ পাতার ফাঁকে উঁকি দিতেই আমার ভাগের ডালিম কতটা হবে তা নিয়ে হিসেবে বসে যেতাম আমি, মনি পিসি এবার প্রথম পাকা ডালিম ফলটা আমি নেবো ।

আসলে ডালিমদানার রঙ আমার এত ভাল লাগতো যে কাঁসার কাচানো বাটিতে নিয়ে আমি ঘুরে ঘুরে এবেলা ওবেলা পার করতাম। বাটি থেকে দু'একটা দানা মুখে যাওয়াই সই।

আমার তো আনন্দ ছিল বাটি থেকে মুঠোয় ডালিমদানা ভরে আবার মুঠোর ফোঁকড় দিয়ে ঝুরঝুর করে বাটিতে ফেলা।

এজন্য অবশ্য খুব বকাও খেতাম, মনি ওতগুলো ডালিমদানা নিস না, নষ্ট করবি তো।

হোক নষ্ট, তবুও আমার ওই কাচানো বাটি ভরে ডালিমদানা চাই-ই।

এসব ব্যাপারে অবশ্য একজন আমাকে সবসময় সাহায্য করতো। ও বৌমা, গিন্নিকে বাটি ভরে ডালিমদানা দাও। ডালিম গাছ তো আমার গিন্নির – দাদু হেসে হেসে মা'কে বলতো।

পৃথিবীর সবকিছুর আবদার করা যেত মানুষটির কাছে।

তবে শুধু ডালিমদানা নয়, পুজোর জন্য কুড়িয়ে আনা শিউলিফুলও ছিল আমার আবদারের আরেক জিনিস।

ঠাকুমার সাথে ভোরবেলায় বাঁশের সাজি ভরে পাশের বাড়ি থেকে শিউলি ফুল কুড়িয়ে আনতাম। শুক্লার ঠাকুমার ছিল সে গাছ। বিধবা সেই বুড়ি ঠাকুমা কিছুটা কুঁজো হয়ে হাঁটতো। সারাক্ষণ ঘরের বারান্দায় বসে থাকতো। ভোর হোক বা সন্ধ্যা রাত, বুড়ি ঠাকুমা বারান্দায় ঘরের বেড়ায় পিঠ ঢেকিয়ে বসে থাকতো সবসময়।

শুক্লাদের বাড়ি মানেই বুড়ি ঠাকুমার ফোঁকলা হাসি, ফুল নিবি ?

ঠাকুমার সাথে ফুল আনতে সে বাড়িতে গেলেই কুঁজো মানুষটি আস্তে আস্তে হেঁটে এসে শিউলি গাছে ঝাঁকুনি দিতো।

ঝরঝর করে শিউলি ফুল পড়ে শুক্লাদের উঠোন ঢেকে যেতো। ঠাকুমা নিজের ফুলের সাজি ভরার পর বুড়ি ঠাকুমার ফুলের সাজিও ভরে দিতো।

আর এরপর থেকেই শুরু হতো ঘ্যানঘ্যান, ও ঠাকুমা আমিও আজ খেলনা বাটিতে পুজা দিবো, আমার ফুল দাও।

পাশেরবাড়ির জেঠি ঠাকুমাকে কিছু পুজার ফুল দিয়ে ঠাকুমা যখন বাড়ি পৌঁছাতো তখনো আমার ঘ্যানঘ্যান চলছে।

তোমার পুজা কখন, দিদি ? আমি আজ তাড়াতাড়ি ঠাকুর শয়ন দিবো, তখন যত লাগে নিও শেফালি ফুল।

আমি তখনো বুঝিনা আজ ঠাকুমার ঠাকুর কেন তাড়াতাড়ি শয়নে যাবে।

তবে অপেক্ষা করতে হয়না বেশী সময়।

সকালের খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই উপরতলার মাটির ডুলি থেকে বড় পাথরের থালা ভরে ঠাকুমা নীচে আনতো ছোট ছোট সোনাই মুগডাল। এরপরেই ছোট বৌমা কুলায় তা ঝাড়তে বসে যেতো। আমি সেখানে ঘুরঘুর করতেই ঠাকুমা গলা চড়াতো, কুলার বাতাস অলক্ষ্মী, সরে দাঁড়াও।

আমি একদৌড়ে তখন বাইরবাড়িতে। কাঠের বেঞ্চা বসে গোলেনারা দাদীর সুপাড়ি কুড়ানো দেখি।

এদিন দুপুরের খাবার শেষে রান্নাঘর মোছার দায়িত্ব মায়ের। উঠোনে এঁটেল মাটি গুলিয়ে ন্যাকরায় নিয়ে মা রান্নাঘর মোছে। মেজো বৌমা গা ধুয়ে ধোয়া কাপড় পড়ে লাল বারান্দায় নারিকেল কুরতে বসে গেছে।

আমিও ভাতঘুম ফাঁকি দিয়ে লাল বারান্দায়।

ঠাকুমার পূজার বাসন কোসনের শব্দে বুঝি, আজ ঠাকুমারও তাড়া।

পুজো শেষে ঠাকুরকে শয়ন দিয়ে ঠাকুমা যখন আমাকে বেঁচে যাওয়া শেফালি ফুল দিতো, ততক্ষণে মেজো বৌমা নতুন গুড় আর কোরা নারিকেল পেতলের কড়াইয়ে মাখিয়ে উনুনে বসিয়েছে।

আমি শেফালি ফুল পেয়ে খেলনা বাটির সরঞ্জাম বের করি। পুতুলকে ঠাকুর বানিয়ে ছোট ছোট হাড়িতে ডালিমফুলে প্রসাদ বানাই। আর সব প্রসাদে শেফালি ফুল দিয়ে চোখ বন্ধ করে ঠাকুমার মতো বিড়বিড় করি।

আর তখনই নারিকেল গুড়ের পাকের গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দেয়। আমি পূজা ভুলে এবার শেফালি ফুল নিয়ে খেলতে বসে যাই।

বাতাসে তখন সেদ্ধ সোনাই মুগের ঘ্রাণ।

ঠাকুমা হাঁক দেয়, বড় বৌমা ...

আমিও কয়েকটি শেফালি ফুল হাতে নিয়ে মায়ের পিছে পিছে রান্নাঘরে যাই।

মা পাটায় সেদ্ধ সোনাই মুগ বাটতে বসে। ঠাকুমা গুড় আর জল মিশিয়ে কড়াই উনুনে দেয় রস বানাতে।

আমার মুঠোর তাপে শেফালি ফুল তখন অনেকটাই বিবর্ণ।

মায়ের বাটা শেষ হতেই পাথরের থালে ঠাকুমা বাটা ডালের সাথে ময়দা মিশিয়ে মন্ড বানায়। এরপর সেই মন্ড থেকে লেচি কেটে ছোট ছোট অনেকগুলো বাটি বানায় ঠাকুমা। সেই বাটিগুলোয় নারিকেলের পুর ভরে মুখ বন্ধ করে হাতের চাপে ঠাকুমা চাঁদের মতো পুলি বানায়।

ও ঠাকুমা, এতো সেমাই ঈদের চাঁদ!

ঠাকুমা সেই চাঁদ গরম তেলে ছেড়ে বলতো, এরজন্যই তো এটা চন্দ্রপুলি।

লাল করে ভাজা পুলি গুড়ের গরম রসে পড়ে অল্পসময় ভাসতো। এরপর একটু একটু রস খেয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতো।

তবে পুরোপুরি রসে টইটুম্বুর হতে সময় লাগতো একরাত।

ঠাকুমা যখন আমার দিকে একটি ভাজা পুলি এগিয়ে দিতো, তখন শেফালি ফুল ফেলে আমি তা হাতে নিতাম।

হাতের শেফালি ফুলের ঘ্রাণ লেগে যেতো সেই পুলিতে।

আর দূরের মসজিদ থেকে ভেসে আসতো মাগরিবের আযান,

'আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ...'

"মানবী"র নেপথ্যে যে মানবী

সাক্ষাৎকার – শমীতা দাশ দাশগুপ্ত

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন – রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার ?" এ প্রশ্ন অনেকদিনের। লড়াই তার থেকেও বেশীদিনের। শমীতা দাশগুপ্ত আমেরিকার বুকে প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি সংস্থা। সংস্থাটির নাম **"মানবী"**। দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতবর্ষের নির্যাতিত মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লড়াইতে পাশে থাকা এই সংস্থার প্রধান কাজ। কাজটি খুব সহজ নয়। কোন সংস্থা গড়ে তোলার যেমন চ্যালেঞ্জ আছে, তার থেকেও বেশী চ্যালেঞ্জ আছে সেটি চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে। গত চৌত্রিশ বছর ধরে মানবী এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কর্ণধারের শ্রম এবং নিষ্ঠার ভূমিকা এ ব্যাপারে অস্বীকার করার উপায় নেই। উইকিপিডিয়ায় ওনার নামের পাশে লেখা আছে "an Asian Indian scholar and activist"। বিদেশের মাটিতে নিজের মহাদেশের মহিলাদের জন্য এমন একটি সংস্থা গড়ে তুলতে লাগে সাহস আর আত্মবিশ্বাস। আর তাই জন্যই শমীতাদির কাছে জানতে চাওয়া ওনার নিজের কথা। ওনার জীবনের আপোষ আর লড়াইয়ের কথা।

আপনি এদেশে কবে এলেন দিদি ?

সে অনেকদিন আগের কথা। আসলে, আমি নিজেকে বলি 'double immigrant'। বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলাম বাবা মার সঙ্গে। আর তারপরে বিয়ে হয়ে আমেরিকায়। ১৯৬৮ সালে আমেরিকায় আসা – হাইস্কুল পাশ করেই।

"মানবী" র ভাবনা মাথায় এল কি করে ?

আসলে আমি বিপ্লবের আবহে বড় হয়েছি। বাবা ছিলেন মাস্টারদার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। বেশ ছোটবেলা থেকেই তাই বিপ্লবের প্রতি টান। এদেশে এসে কলেজে পড়াশোনা শুরু করলাম। তখন থেকেই নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। মেয়েদের প্রতি অবমাননা আর অসম্মানের বিরুদ্ধে কেউ কোন কাজ করছে জানলে সেখানে অংশ নিতে থাকি। আমার মনে হতো মেয়েরা ন্যায় পাচ্ছে না। সেই ভাবনা থেকেই এই লড়াইয়ের শুরু।

দক্ষিণ এশীয় বা ভারতীয় মহিলাদের কথা বিশেষভাবে কেন ভাবা ?

এর পিছনে একটা গল্প আছে। ১৯৮১ সালের কথা। এক ভারতীয় মহিলা স্বামীকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। দুই সন্তানের মা তিনি। মামলা চলাকালীন তিনি বলতে থাকেন তাঁর উপর যে অকথ্য নির্যাতন চলেছে সেই কথা। তিনি মুক্তি পান বিচারে। সাময়িকভাবে তিনি মস্তিষ্কের সুস্থতা হারিয়েছেন

এই যুক্তিতে। তখনই আমার মনে হয় হয়তো আমাদের ভারতীয় বিয়ের যে উজ্বল ছবি আঁকা হয় তার আড়ালে একটা অন্ধকার দিক আছে। "মানবী" সংগঠনের পিছনে এই ঘটনা একটা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এই মামলার পরে আমরা ছজন "মানবী" তৈরীর কাজ শুরু করি।

মা ঠাকুমার সময়ে মেয়েদের পরিস্থিতি আর এখন মেয়েদের পরিস্থিতির কি বদল হয়েছে ?

কিছুটা তো হয়েছে। তবে এখনো অনেক কাজ বাকী। এখন অনেকের মুখে শুনি যে আজকালকার মেয়েরা বড় বেশী অধৈর্য। মানিয়ে নিতে পারে না। আসলে আমাদের মা ঠাকুমার মনেও কিন্তু অশান্তি বা অসন্তোষ ছিল। তাঁরা প্রকাশ করেন নি। এখনকার মেয়েরা প্রকাশ করছে – এটাই তফাৎ।

মানবী ঠিক কিভাবে নির্যাতিত মহিলাদের পাশে দাঁড়ায় একটু বলবে ?

হ্যাঁ। এটার বিভিন্ন দিক আছে। প্রতি বছর প্রায় তিনশো বা সাড়ে তিনশো মতো আবেদন আমরা পাই। এডভোকেসি, কাউন্সেলিং ,আইনি সাহায্য, গোপন জায়গায় আশ্রয়, নিজের পা এ দাঁড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ – এগুলো কয়েকটা দিক। তবে আমাদের কাজের ক্ষেত্র অনেকটা বড়। আমরা আরো নানাভাবে চেষ্টা করি এইসব মহিলাদের সাহায্য করতে যাতে তাঁরা লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পান। আমরা তাঁদের option দিই নানারকম। কখনো তাঁদের হয়ে সিদ্ধান্ত কিন্তু নিই না। তাঁদের সামনে যেসব রাস্তা খোলা আছে সেগুলোর সন্ধান দেওয়া বা যাতে তাঁরা সে পথে হাঁটতে চাইলে হাঁটতে পারেন সেই সুযোগ করে দেওয়া "মানবী"র প্রধান কাজ। মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল হাতে সাহায্য করা এই কাজের একটা বিশেষ দিক। It is an empowerment based program ।

আর্থিক সংস্থান কিভাবে হয় শমীতাদি ?

আমাদের অনেক collaboration আছে। International Standing আছে। কিছু federal আর state funding ও আছে।

একটা প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরছে। ঠিক কিভাবে করবো বুঝতে পারছি না।

করেই ফেল।

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় সারা পৃথিবীতে যত সংঘবদ্ধ ধর্ম আছে, সেখানে নারীদের একটা অসম্মানের জায়গা প্রতক্ষ্যে বা পরোক্ষে তৈরী করা হয়েছে ?

একেবারেই। আসলে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যেই নারীকে অবমাননার বীজ বোনা আছে। ধর্ম তো সঙ্গস্কৃতির অঙ্গ। আবার শাস্ত্রে অনেক জায়গায় মহিলাদের শ্রদ্ধার আসনে বসান হয়েছে। সে দিকগুলো অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কেন ? এটা পুরুষরা নিজেদের সুবিধামতো অনেক জায়গায় ব্যাখ্যা করেছেন। কোরানে মহিলাদের অনেক অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেসব অস্বীকার করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটা প্রশ্ন। কখনো কি মনে হয় কোথাও যেন মহিলারা নিজেরাও নিজেদের মুক্তির পথে অন্তরায় ?

আসলে মানুষ তো চারপাশ দেখে শেখে অনেক কিছু। মূল্যবোধ পরিবেশ থেকে আহরণ করে। কোন পরিবারে একটি মেয়ে যদি ছোট থেকে পুরুষদের প্রাধান্য দেখে বড় হয়ে ওঠে, দেখে যে মা, মাসি বা ঠাকুমারা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের খুশী করতেই সদা তৎপর তাহলে সেই ধারণাটা তার মধ্যেও গেঁথে যায়। এর আর একটা কারণ হল অর্থনৈতিক পরাধীনতা। পরিবারে পুরুষ সদস্য উপার্জনশীল। তাই পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাঁর উপর নির্ভর করতে হয়। আর তাই তাঁকে খুশী রাখার চেষ্টা করা আর কি! তবে মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সমাজ-সংসারের মানসিকতা বদলানো জরুরী।

কি মনে হয় তোমার ? এ লড়াই কিভাবে চালিয়ে যেতে হবে ? ভবিষ্যৎ কি ?

লড়াই তো চালাতেই হবে। এখনো অনেক অন্ধকার সমাজের বুকে। আমার মনে প্রতিটি দক্ষিণ এশীয় মহিলার এ ব্যাপারে সচেতন হতে চেষ্টা করার সময় এসে গেছে। জানতে হবে। পড়াশোনা করতে হবে। সমাজে মেয়েদের অবস্থান বুঝতে হবে অভিজ্ঞতা দিয়ে। আলোচনা, কথাবার্তা চালিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনা খুব সুখকর নয়। অনেককে অস্বস্তিতে ফেলবে। কিন্তু তাও থামলে চলবে না। নারীদের অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদে সরব হতেই হবে।

সক্রিয় আন্দোলন আর সাহিত্যচর্চা – দুটো দুরকম ক্ষেত্র। কখনো কি মনে হয় পরিবর্তন আনার হাতিয়ার হিসেবে একটার থেকে অন্যটা বেশী উপযোগী ?

না, তা মনে হয় না জানো। আমার মনে হয় দুটো পাশাপাশিই চলতে পারে। কোন বিরোধ নেই।

তোমার সাহিত্যচর্চার কথা একটু বলবে ? তুমি নিজে লেখো। বাড়ীতে লেখক। তোমার কন্যা এবং স্বামী দুজনেই লেখালেখির জগতে বেশ সুপরিচিত নাম। তাই জানতে চাই।

আসলে আমি ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির আবহে বেড়ে উঠেছি। লিখতে ভাল লাগে। শুরুতে কবিতা আর নানাধরণের article লিখতাম। তখন সময়ও তেমন পেতাম না লেখার। অধ্যাপনা পেশা ছিল আমার। খুব ব্যস্ততার মধ্যে দিন কেটেছে। যতকিছু লেখার ইচ্ছে তত সময় ছিল না। পরের দিকে রহস্য গল্প লেখার ঝোঁক হল। মেয়েদের জীবন নিয়ে রহস্যকাহিনী।

কেন রহস্যকাহিনী ?

মনে হয় রহস্যকাহিনীর মধ্যে দিয়ে বললে পাঠকেরা গল্প পড়ার আগ্রহে বেশ তরতর করে পড়ে ফেলবে গল্প। আর একইসঙ্গে মেয়েদের জীবনের নানা সমস্যা, দ্বন্দ্ব, চ্যালেঞ্জ এসবের কথাও জানতে পারবে। রহস্যগল্প তাদের পরিস্থিতিটা তুলে ধরার একটা পন্থা বলে আমার মনে হয়েছে। সহজে অনেকের কাছে পৌঁছন যেতে পারে এর মাধ্যমে।

রহস্যগল্প ও মহিলাদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা তাহলে ?

একেবারেই তাই। আমার ডিটেকটিভও মহিলাচারিত্র।

মহিলাদের লড়াই তোমার জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। একজন মহিলা হিসেবে তোমার নিজস্ব লড়াইয়ের কথা বলবে ? পাশে কোন বিশেষ মানুষকে পেয়েছো সহযোদ্ধা হিসেবে ?

আমার লড়াই বলতে (একটু থেমে) – আমার অনেক ছোটবেলায় বিয়ে হয়। তারপর পরিচিত সবকিছু ছেড়ে এদেশে চলে আসি। আমার একটি কন্যাসন্তান হয়। আমি এদেশে কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা শুরু করেছি আবার মেয়ে হওয়ার পরে। ছোট বাচ্চা নিয়ে পড়াশোনা করার নানারকম চ্যালেঞ্জ তো আছেই। তাছাড়া জীবনে চলার পথে কতরকম বাধাবিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়। সেসব থেকে শিক্ষালাভও করেছি। এসবই learning experience। আর পাশে থাকার মানুষ হিসেবে কোন একজনের কথা বলা সম্ভব নয়। আমার খুব ভাল কয়েকজন feminist বন্ধু ছিল। তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা হত। অনেক শিখেছি এবং জেনেছি তাদের থেকে।

ধন্যবাদ শমীতাদি। ভাল থাকবেন। সুস্থ থাকবেন আপনি আরো কাজ করতে থাকুন। তোমরাও ভাল থেকো।

পল্লববরন পাল

অলোকরঞ্জন – শব্দযন্ত্রী শব্দগ্রন্থী

অসাধ কুর্নিশ-কোণে মাথা সামনের দিকে হেলিয়ে অলোকরঞ্জন প্রসঙ্গে তাঁর প্রিয় কবিবন্ধু শঙ্খ ঘোষের স্বীকারোক্তি – "জার্মানি থেকে টেলিফোনে একটি মেয়ের প্রসঙ্গে বলল – দজ্জালিকা। কাউকে লাই দিতে নেই, এ তো আমরা হামেশাই বলে থাকি। বলে অলোকও। কিন্তু সে বলে – চৌ-এন লাই দিতে নেই। মেয়ের দিকে অতিশয় নজর দিতে দিতে ভারাক্রান্ত বাবা অলোকের কাছে 'কন্যাকুজ'। বলপেনের কালি ফুরিয়ে আসছে ? তার মানে কলমের লিপস্টিক মুছে গেছে। ... চিঠি না পেলে সেটা হয় 'অপত্রক' দশা আর নয়তো 'শব্দ সাড়া নেই'।" শব্দের এই বিচিত্র বুনন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সমগ্র কবিতাযাপনময় মণিমুক্তোর স্থির প্রদর্শনী।

কবিতা কী – এই কঠিন প্রশ্নের উত্তরে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানালেন – "কবিতা আসলে শব্দ নয়, বরং শব্দকে ব্যবহার করবার এক রকমের গুণাপনা।" বাঙলা কবিতার ইতিহাসে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের এই শব্দ ব্যবহারের গুণাপনা একেবারেই এক স্বতন্ত্র মৌলিক একচ্ছত্র মালিকানা, যার পূর্বসূরীও যেমন নেই, উত্তরসুরীও নেই। অবশ্য এই নবধারাজলে নীপবনে ছায়াবীথির শরণার্থী শিবিরের ভিসা পেতে গেলে শব্দ ও ভাষার যে নিবিড় অনুশীলন ও দুরূহ দখল আবশ্যিক, তা অর্জন করতে শান্তিনিকেতনের উদাত্ত আশ্রমিক দীক্ষাসূত্রপাত, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ব্রহ্মচর্যসমাপ্তির স্নানারোহ, প্রেসিডেন্সির স্নাতকোত্তর অধ্যায় শেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনা, 'ভারতীয় লিরিকের উৎস ও ক্রমবিবর্তন' নিয়ে গবেষণা, হুমবোল্ট ফাউণ্ডেশনের প্রকল্পে ফেলোশিপ নিয়ে জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তুলনামূলক অন্বেষা – ধারাবাহিক এই সবকিছুর অজস্র অব্যর্থ আন্তর্জাতিক বীক্ষণহিম্মত লাগে। শব্দ নিয়ে নিঃশব্দ অলৌকিক তপস্যাসহবাস লাগে।

শব্দ কীভাবে তার অর্থকে অতিক্রম করে যায়? আমাদের অভিজ্ঞতার সরল জবাব - একক শক্তিতে সেটা অসম্ভব। প্রতিটি শব্দেরই একটি নির্দিষ্ট নিজস্ব অর্থ আছে, এবং, একক অবস্থায় সেই অর্থের আশ্রয়েই তার নিশ্চিৎ বসবাস। বাক্যে প্রয়োগ হলেও যে তার বাসস্থান বদল হয়, তা নয়। এইখানে এসে একটু থামতেই হয়। সত্যিই কি তাই ?

জীবনানন্দ সভাঘরে
তোমায় ডেকেছি সমাদরে
তারপর ভিড় হতেই
দুজন বসেছি বারান্দায়
শুভেন্দু শোনো, এছাড়া আর আমাদের কোনো তীর্থ নেই।

এই 'তীর্থ' শব্দটির একক অবস্থান কি বদল ঘটলো না বাক্যের মধ্যে তার এই অযাচিত ব্যবহারে ? এই বাসাবদল আবার তখনও ঘটে, যখন ঠিকমতো নির্বাচিত দুই বা ততোধিক শব্দ পরস্পরের কাঁধ ছুঁয়ে এসে দাঁড়ায়। এবং আমরা লক্ষ্য করি যে, এই নৈকট্যের সাথে সাথেই শব্দের সেই অর্থগত নিশ্চলতা ছাপিয়ে তারা পরস্পরের সহযোগে তাদের ধরাবাঁধা অর্থকে অতিক্রম করে অন্যতর কোনও অর্থ অথবা তাৎপর্যকে উল্লেখ করতে চাইছে। অর্থাৎ, অর্থের বিচারে যা ছিল নেহাতই একমাত্রিক বা 'ওয়ান-ডাইমেনশনাল', সহসা সে একটি বাড়তি মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে।

অনন্তের স্তনবৃন্তে শরণার্থী এক শিশু ঘুমিয়ে রয়েছে,
ভূমধ্যসাগরে ওরা দুইজন একই নৌকায়
ভেসে আছে, ইটালির দিকে ওই মগ্নতরী দোলে;

শিশুটির মা নেই, অনন্ত তাকে দুধ দেবে বলে
এক অপ্সরীর কাছে একটি স্তনযুগ ভিক্ষা চায়।

এক শব্দের সঙ্গে আরেক শব্দের নিবিড় সহবাসসঞ্জাত তৃতীয় এক শব্দরূপের শব্দাতীত সম্মোহনের রাষ্ট্রে অলোকরঞ্জনই একনায়ক। এবং এইখানেই গদ্যের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য। গদ্যও এক ধরনের শব্দরূপ, আমাদের ভাবনাকে সে-ও শরীরী মাত্রা দেয়, কিন্তু শব্দ সেখানে তার স্বাভাবিক আভিধানিক অর্থের সীমানা ছাড়ায় না। কবিতার শব্দের ক্ষেত্রে সেই প্রাথমিক শর্তটাই নেই, বরং নিরন্তর অতিক্রমণের প্রতিনিয়ত দুর্নিবার ব্যকুলতা থাকে। অন্যতর অর্থ কিংবা বোধের দিকে তার অনবরত অঙ্গুলি-ইঙ্গিত। এই সাধারণ অর্থকে অতিক্রম করে যাওয়ার পদ্ধতিকেই বলে ব্যঞ্জনা, আর অলোকরঞ্জন তাঁর কবিতায় এই ব্যঞ্জনরন্ধনকে এক আন্তর্জাতিক সুস্বাদু মাত্রায় উত্তীর্ণ করেছেন।

সশব্দ শব্দের অনন্য উচ্চারণেই অলোকরঞ্জনী কবিতার সমৃদ্ধি। এবং বাঙলা কাব্যইতিহাসে অলোকরঞ্জনের কাব্যভাষাকে বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতা দেয় তাঁর এই শব্দাতীত অতিক্রান্ত চিত্র নির্মাণ। উপরের কবিতায় এক শিশুকে দুধ খাওয়াবে বলে অনন্ত পুরুষ এক অপ্সরীর কাছে স্তন নয়, স্তনযুগ ভিক্ষে করছে – 'স্তনযুগ' – স্তনের সাথে যুগের সখ্যতার কথা অলোকরঞ্জনই প্রথম ঘোষণা করলেন – নতুন শব্দনির্মাণে এই আচমকা নতুনতর চিত্রকল্প বাঙলা কেন বিশ্বসাহিত্যে কেউ এর আগে আঁকবার হিম্মত দেখিয়েছেন কখনও? শব্দবিন্যাসে অলোকরঞ্জনের এই অগাধ একনায়কতন্ত্র শুধু তাঁর কবিতায় নয়, যাপন-অভ্যাসেও সাবলীল ছিলো। এরকম শব্দের সাথে শব্দ জুড়ে খেলার নেশায় অলোকরঞ্জন এরকম অসংখ্য ব্যঞ্জনাময় শব্দযৌগ উপহার দিয়েছেন। যেমন –

- ঘৃণায় হবে সে 'আগুনঝুরি'
- অমিত 'অ্যালকোহলিকতা' বুঝি ভালো ?
- তারই সঙ্গে ছিল কিছু 'তরঙ্গদ্রাঘিমা'
- 'কান্নাকীর্তনীয়া' জলজ্যান্ত হোক
- 'স্বননসূর্য'-এ কোন শব্দ
- জল্লাদের খড়্গ হয়ে 'মৃত্যুমিথুনমশাল' ঝল্‌মলালো

অজস্র উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। শব্দের বিচিত্র বুনন তাঁর নেশা। নমুনা কবিতার ছত্রে ছত্রে – আত্মপ্রকাশ থেকেই স্বকীয় আলোকে রঞ্জিত – প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'যৌবন বাউল'-এ বিচিত্র ভাবনা ও অর্থবোধী এইসব অত্যাধুনিক বহুমাত্রিক শব্দব্যঞ্জনা যে কোনো পাঠকের অবলীলা আকর্ষণ আদায় করে। অলোকরঞ্জনের এই শব্দনির্মাণের অভিনবত্বের আরো কিছু নমুনা উল্লেখ প্রাসঙ্গিক।

- বিদেশী শব্দের আত্মীকরণ – হামেশাই আমরা কথা বলার সময় বেশ কিছু বিদেশি শব্দ ব্যবহার করি। অলোকরঞ্জন এই রীতিকে পূর্ণমর্যাদায় প্রয়োগ করেছেন বাঙলা কবিতায়। যেমন – "উপযুক্ততা যাদের রয়েছে 'অ্যাপ্লাই' করবে না", অথবা "'স্টুডিয়ো' করে নেন নির্বাচন"। এছাড়াও – অ্যাবস্যাডত্ব, অ্যালকোলাহল, নিসর্গনার্সারি, গ্লোবপল্লি ইত্যাদি শব্দযৌগ তার কবিতায় অসংখ্যবার এসেছে।
- সমাসবদ্ধ পদ – জয়শ্রীজীবন, কুহেলিঘনিম, যৌবনবাউল, নরলোকনিয়তি, দরিদ্রধূসর ইত্যাদি।
- বিপরীতার্থক শব্দ – অপটুয়া, অতৃণ, অপূর্বসূরী, অপ্রতাপ ইত্যাদি – "গঙ্গাজলে উঠুক পাপ/ সূর্য হোক অপ্রতাপ/ সকালে, আমি কিরণ বিকাবো না।"

- অপ্রচলিত শব্দ – কুর্পাসক, কুপর্দক, শামাদান, অধ্যাস, অবাঙ্মুখ ইত্যাদি।
- আলোকরঞ্জিত শব্দ – রবীন্দ্রএলিট, আড়ভাবুক, থিয়োরিবিদ্ধ, কোহলবিলাসী, সমিতিযন্ত্র, মৃদুগ্র, অভিধায়ন, ভরসাভ, বিশ্বগ্রামীণ – ইত্যাদি অসংখ্য নতুন শব্দ মৎসবীজের মতো বাঙলা অভিধানে শাঁখ বাজাতে বাজাতে অনায়াস-অভ্যাসে বেমালুম ঢুকে পড়লো, যেন বেদযুগ থেকে তৎসাময়িক বংশপরম্পরার প্রযত্নে এ অভিধানবাস।

ভাষা ও শব্দের মধ্যবর্তী দূরত্ব নিয়ে অলোকরঞ্জনের আত্মসমর্থন – "ভাষা এবং শব্দ এক নয়। ভাষার মধ্যে ধ্বনি আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। তা নাহলে অর্থহীন বৈদিক স্তোভধ্বনি ঐ মর্যাদা পেত না, ব্রজবুলির মতো আবেগনিয়ন্ত্রিত, ব্যাকরণবিস্মৃত ভাষা পেতাম না আমরা। আধুনিক কবিতার শব্দই সমগ্র ভাষাকে কোণার্ক কিন্নরীর চিবুকে ক্ষোদিত করে তুলে ধরেছে। অনন্ত শূন্যের দিকে মালার্মে সাদা কাগজ মেলে রেখেছিলেন, ভাষার ভাষা পরম শব্দকে অভ্যর্থনা করে নেবেন বলে। বাঙলা কবিতায় এই মুহূর্তের শব্দৈষণা বিশ্লেষণ করলে দেখবো মালার্মের নিরঞ্জন সেই শব্দসন্ধানে এসে মিলেছে জীবনানন্দের শব্দব্যক্তিত্ব।"

সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতার একচ্ছত্র ও উজ্জ্বলতম আন্তর্জাতিক মুখ **অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত** – রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কবিদের মধ্যে কবিতানির্মাণে শব্দসংস্থিতির ব্যঞ্জনায় নিপাট নির্জন ব্যতিক্রম হিসেবে সিদ্ধ ও সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঘোষণা করেছিলেন তাঁর বাসনাপ্রস্তাব – সাদামাটা আটপৌরে শব্দে কথ্যভাষায় কবিতা লিখবেন। অমনি সমসাময়িক আর এক অলোকসামান্য নির্বিকল্প কবি কোলরিজ রেরে করে উঠলেন, যাঁর বক্তব্য, কাব্যিক শব্দসুষমার প্রতি কবিতার আন্তরিক আনুগত্য একান্ত আবশ্যিক। এই দুই সোচ্চার পক্ষ যখন পরস্পর ধুন্ধুমার, তখন স্যার ওয়ালটার রলি বিচারকের মীমাংসা সূত্র নিয়ে এলেন, বললেন – কাব্যভাষা নির্মাণে শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম, তেমনি 'ওয়ার্ড অর্ডার' বা শব্দবিন্যাসের গুরুত্বও এতোটুকু কম নয়।

বাঙলা সাহিত্যে কাব্যভাষা তার হাজার বছরের কৌলিন্য ভেঙে আটপৌরে হয়েছে গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে – সাধু থেকে চলিতও হয়েছে ঐ সময়েই। 'বেতন পঁচিশ টাকা, সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরাণি। খেতে পাই দত্তদের বাড়ি ছেলেকে পড়িয়ে। শেয়ালদা ইষ্টিশনে যাই, সন্ধ্যেটা কাটিয়ে আসি ...' – টানা লিখলে পরিষ্কার গদ্য বলে বেমালুম চালিয়ে দেওয়া যায়। রবীন্দ্রযুগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নজরুল দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যেন্দ্রনাথদের দিয়ে শুরু, তারপর কল্লোলযুগে সমর সেন প্রেমেন্দ্র মিত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়দের হাতে কথ্যভাষায় কথ্যশব্দ দিয়ে কবিতা নির্মাণে আধুনিকতায় অভ্যস্ত হলো বাঙলা কবিতা। কবিতার এই কথ্যভাষারূপকে অলোকরঞ্জন প্রায় একাই হাত ধরে টেনে নিয়ে ঢুকলেন বিউটি পার্লারে। কাব্যিক শব্দসুষমার প্রতি কোলরিজিয় আনুগত্য নয়, কিন্তু কাঁধে কাঁধ সৌভ্রাতৃত্বকে মর্যাদা দিলেন অলোকরঞ্জন। আটপৌরে সুন্দর ফেসিয়েল মেখে রূপসী হয়ে উঠলো বাঙলা কবিতা।

বিচিত্র এক অত্যাধুনিক শাস্ত্রীয় কাব্যভাষায় কবি অলোকরঞ্জন অনর্গল কথা বলেছেন তাঁর স্বখোদিত রেওয়াজী স্বরে – যে ভাষা গভীর অনুশীলিত উপলব্ধির সহজ শরীরী অনুবাদ। অলোকরঞ্জনের কাব্যভাষা বিশ্লেষণে প্রথম নজর পড়ে নির্মিত শব্দের এই বিন্যাসচমকের ওপর। শব্দের এই বিদগ্ধ আয়োজন সম্পর্কে স্বকলমে অলোকরঞ্জন বলেন – 'সমার্থক শব্দ বলে কিছু নেই, আছে বোধিদ্রুমে বরদ শব্দকল্প। অথবা এক-একটি শব্দ, আজকের সময়ের বিশিষ্ট মানুষের মতো, এক-একটি ব্যঞ্জনাসঙ্কুল দ্বীপ। অর্থাৎ একটি কবিতা একটি দ্বীপপুঞ্জ যেখানে এক-একটি শব্দের অনাশ্রয়িতা শেষ অবধি মুছে গিয়ে পরম আশ্রয়ের মতো হয়ে ওঠে'। কবির এই অভিনিবিষ্ট অনুভূতি কবিতাপাঠককে শীলিত শিষ্টতায় অনর্গল বিদ্বান করতে করতে এক অনন্ত অভিসার-ভ্রমণে মেতে ওঠে।

আগেই বলেছি, কাব্যভাষা নির্মাণে অলোকরঞ্জন একনায়ক। তাঁর এই নিজস্ব প্রকরণকৌশল সম্পূর্ণ আলাদা ঢঙে

শব্দের মতোনই পূর্ণাঙ্গ বাক্যবিন্যাসেও সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। তিনি স্বীকার করেন কবিতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা কবির শিল্পিত স্বভাবের ওপর নির্ভরশীল।

"ভগবানের গুপ্তচর মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর

ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না।"

পরবর্তী প্রজন্ম কিন্তু প্রাণিত হলেও অলোকরঞ্জনের এই কাব্যভাষা অনুকরণের স্পর্ধা দেখায়নি, তার একটা কারণ, অলোকরঞ্জনকে অনুধাবন করতে গেলে নিজস্ব জ্ঞানের বিস্তৃত পরিসর দরকার, তাঁর ছন্দ মিলের সাথে সাথে শব্দের বিচিত্র সমন্বয়ও কবিতাকে যেভাবে আকর্ষক করে গড়ে তোলে, সেই গোটা অধ্যায়ে বিদগ্ধ হতে হয়। কখনো খুব সহজ কথা তির্যক উসকানিতে, আবার কখনো দুর্বোধ্য জটিলতাকে সহজ-সরল শব্দে প্রকাশ করেছেন – যা সচেতন পাঠককে এক রহস্যময় বিপ্রতীপের অকপট আন্তরিক দুনিয়ার সন্ধান দেন। 'ধুলোমাখা ঈথারের জামা' কাব্যগ্রন্থের উদ্দীপন বিভাব হিসাবে ভারতীয় কবিসুলভ জহরকোট পরিহার কথা বলে আগামী প্রজন্মকে কবিতা লেখায় মৌলিক ও মুক্ত অননুকরণীয় প্রয়াসে প্রচলিত প্রথা ভেঙে এগোনোর সাহস যুগিয়েছেন।

"আমারো মৃত্যুকে মৃত্যুহীন
সমীচীন
ক'রে যাব ব'লে
চলেছি, আমার হাতে শতাব্দীর সতী
স্তব্ধ, তবু মরণেরও তপস্যার দোলে,
অতসী অঙ্গের অনু দিকে-দিকে সিংহদ্বার খোলে,
আমারো এখন থেকে আজীবন আয়ুর আরতি"

বিষয় নির্বাচন, চিত্রকল্প নির্মাণ কৌশলের পাশাপাশি শব্দগ্রন্থন ও সৃষ্টিশীল বয়ানে তাঁর কবিতা ভীষণভাবেই মৌলিক। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা উত্তরৈবিক বাংলা কবিতার তো বটেই, আবহমান বাংলা কবিতার নিরিখেও আমাদের এক উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। তাঁর কবিতা আমাদের মাতৃভাষার আকম্প্র সীমারেখাকে সম্প্রসারিত করে দেয় এক ধাক্কায়।

এ একেবারেই অলোকরঞ্জিত ব্রান্ডিং – দুলালের তালমিছরি বা মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের মতো, ছবি ও সহি দেখিয়া লইবেন, এবং যার কোনো শাখা নাই।

আদনান সৈয়দ

ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায় এবং একজন আবুল হাসনাত

আবুল হাসনাত এর প্রকৃত পরিচয় কী ? তিনি কি লেখক ? সম্পাদক ? বুদ্ধিজীবী ? নাকি একজন নিপাট ভদ্রলোক ? জানি এ ধরনের বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বদের নাম উচ্চারণ করলে ঠিক এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি কে ? কোন নামে আর পরিচয়ে ইতিহাস তাঁকে করবে ?

আবুল হাসনাতকে আমি চিনেছিলাম আমার দুরন্ত কৈশোরে। তবে আবুল হাসনাত নামে নয় ভিন্ন এক নামে অর্থাৎ মাহমুদ আল জামান নামে। অনেক পরে বড় হয়ে আবিস্কার করেছি এই মাহমুদ আল জামানই বিখ্যাত লেখক এবং সম্পাদক আবুল হাসনাত। মাহমুদ আল জামান নামে তিনি শিশুদের জন্যে লিখতেন, কবিতা লিখতেন। এই নামটি ছিল তাঁর ছদ্মনাম। শিশু কিশোরদের জন্যে লেখা তাঁর অনন্য একটি গ্রন্থ "ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায়" এবং সেই গ্রন্থের লেখক মাহমুদ আল জামানের নামটি আমার কৈশোরের ধুলোবালি মাখা স্মৃতিপটে সবসময়ই যুক্ত হয়ে আছে। শিশু ও কিশোরদের জন্যে তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে "টুকু ও সমুদ্রের গল্প", "যুদ্ধদিনের ধূসর দুপুরে", "রানুর দুঃখ – ভালোবাসা"র নাম উচ্চারণ করা যায়।

বড় হয়ে অবাক চোখে আবিষ্কার করি লেখক এবং সম্পাদক আবুল হাসনাতকে তাঁর সম্পাদিত শিল্প সাহিত্যের পত্রিকা "কালি ও কলমের" মাধ্যমে। আগেই জানা ছিল এই আবুল হাসনাতই ছিলেন দৈনিক সংবাদ এর জনপ্রিয় সাহিত্যপাতার অমর সৃষ্টি 'সাহিত্য সাময়িকী'র সম্পাদক। প্রায় চারদশক ধরে তিনি সেই পাতাটি শুধু সম্পাদনাই করেননি সেই সঙ্গে বাংলাদেশে একটি বিদগ্ধ পাঠকসমাজও তৈরি করেছিলেন। আবুল হাসনাত বলুন আর মাহমুদ আল জামান বলুন তিনি তাঁর লেখালেখি, সম্পাদনা এবং আরো অন্যান্য কাজ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজ সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন। ভালো করেই জানি এই গুণী মানুষটিকে নিয়ে আরো অনেক লেখালেখি হবে এবং যতই দিন যাবে তাঁর সৃষ্টি, মেধা এবং সত্তার চুল চেরা বিচার বিশ্লেষণও ঘটবে। আমি আমার এই লেখায় ব্যক্তিগতভাবে একজন আবুল হাসনাতকে যেমন দেখেছি সেই নিয়ে কিছু স্মৃতিচারণ করার চেষ্টা করছি মাত্র !

আগেই বলেছি তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে সাহিত্য পত্রিকা "কালি ও কলমের" সৌজন্যে। কারণ আমি "কালি ও কলমের" একজন নিবিষ্ট পাঠক। তাঁর কথা স্মরণ হলেই শুধু মনে হয় এমন মানুষও পৃথিবীতে জন্মান! এত নির্মোহ, ভদ্র এবং অমায়িক মানুষ এবং সম্পাদক আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে সত্যি খুব বেশি একটা দেখিনি। তিনি মানুষতো নন যেন সাক্ষাৎ দেবতা ! এই ধরনের মানুষদের জীবনের নানা গল্প লিখতে গেলেও ভয় পাই ! কারণ হাসনাত ভাই নিজেই তা অপছন্দ করতেন। তিনি নিজেকে গুটিপোকার মত গুটিয়ে রাখার এক মানুষ।

বর্তমান এই ডিজিটাল দুনিয়ায় মানুষ যখন উলঙ্গভাবে ঢাক ঢোল পিটিয়ে নিজেই নিজের আত্মপ্রচারে নেমেছে তখন আমরা সম্পাদক আবুল হাসনাত এর জীবন থেকে কিছু শিক্ষা পেলেও পেতে পারি ! এমন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেছিল সেই আলোর ঝর্ণাধারায় আমাদের হেটে যেতে বাঁধা কোথায়!

লেখক এবং সম্পাদক আবুল হাসনাত এর সঙ্গে আমার পরিচয় ২০০৭ সালে খুব কাকতালীয়ভাবে। আমার সঙ্গে তখন নিউইয়র্কে কবি শহীদ কাদরীর বেশ দহরম মহরম চলছে ! কবি শহীদ কাদরীর সঙ্গে সেই সময়টা ছিল তখন আড্ডা, কবিতা আর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি, কাটাকাটি আর মাখামাখি করার সময়। নিউইয়র্কের কঠিন পাথুরে

মাটিতে তখন শহীদ কাদরীর সঙ্গে আড্ডা আমার জন্যে ছিল মরুভুমিতে মরূদ্যান এর খোঁজ পাওয়ার মত। সোমবার থেকে শুক্রবার অফিস তারপর শনিবার আর রবিবার ছুটির দিনে কবি শহীদ কাদরীর বাড়িতে বেহিসেবি আড্ডা। সেই আড্ডার ফসল হিসেবেই একদিন মনে হল শহীদ কাদরীর কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখলে কেমন হয় ! ভাবনাটা মাথায় আসতেই "শহীদ কাদরী ও তাঁর কবিতা" এই নিয়ে বড় একটি প্রবন্ধ লিখে ফেলি। তারপর ভাবতে শুরু করি এখন এটি পাঠাই কোথায় ! তখন নিউইয়র্কে শিল্প সাহিত্যের খোরাক আর ইন্ধন জোগাত বাংলাদেশ থেকে আসা সাহিত্য পত্রিকা "কালি ও কলম" এবং কলকাতার থেকে আসা "দেশ"। নিউইয়র্কের এই তামাটে মাটিতে তখন এই দুটো পত্রিকাই আমি গোগ্রাসে গিলছি। একদিন কোন কিছু না ভেবেই লেখাটি ইমেলে পাঠিয়ে দিলাম "কালি ও কলম" সম্পাদকের কাছে। তারপর শুরু হয় অপেক্ষার পালা। আমার মত অচেনা এক লেখকের লেখা পেয়ে বিখ্যাত সম্পাদক/লেখক কি ভাববেন, কি হবে না হবে এসব ভাবনাগুলো কল্পনার সুতো দিয়ে মালা গাঁথা ছাড়া তখন আমার কিইবা করার ছিল ! এক সন্ধ্যায় সেই চিঠির কাঙ্খিত উত্তর এল। খুব অল্প কয়েকটা লাইন। কিন্তু সেই অল্প কয়েকটি শব্দে আমি কল্পনায় দেখতে পেয়েছিলাম আপাদমস্তক নিপাট এক ভদ্রলোকের মুখ। জানালেন আগামী সংখ্যায় আমার "শহীদ কাদরী ও তাঁর কবিতা" প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে চিঠিতে ছোট একটি অনুরোধও রাখলেন। "যদি সম্ভব হয় শহীদ কাদরীর নতুন কোন কবিতা এবং তাঁর একটি সাক্ষাৎকার 'কালি ও কলমের' জন্যে তৈরি করবেন"। তাঁর চিঠির প্রতিটা শব্দে এত বিনয়মাখা ছিল যে তখন লোকটাকে সামনাসামনি দেখার লোভ সামলানো কঠিন হয়ে গেল। বলা যায় সেই থেকে শুরু। "কালি ও কলমে" শহীদ কাদরীর নতুন কবিতা, তাঁর সাক্ষাৎকার, তাঁর কবিতার উপর প্রবন্ধ নিয়ে নিত্যই "কালি ও কলমের" দরজায় টোকা দেই। তারপর ধীরে ধীরে শহীদ কাদরীর জগৎ থেকে বেরিয়ে শিল্প সাহিত্যের নানা জগতে যখনই ঢুঁ দিয়েছি হাসনাত ভাই তাঁর "কালি ও কলমের" দরজাটি আমার জন্যে শুধু উন্মুক্তকরে দিয়েছেন। আপনারা হয়তো জানেন কবি শহীদ কাদরীকে তিনি অসম্ভব ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। শহীদ কাদরীও আবুল হাসনাত বলতে পাগল ছিলেন। কবি শহীদ কাদরীর কবিতা নিয়ে লেখার মধ্য দিয়ে এভাবেই শুরু হল লেখক এবং সম্পাদক আবুল হাসনাত ও তাঁর "কালি ও কলমের" সঙ্গে পথ চলা। তারপর কতগুলো বছর ! কত গল্প আর জীবনের কত গান !

গত বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালে আবুল হাসনাতকে নিয়ে নিউইয়র্ক জ্যাকসন হাইটসে মুক্তধারা (প্রকাশক এবং বইয়ের দোকান) একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলাম আমি। মনে আছে সঞ্চালনার এক ফাঁকে শুধু বলেছিলাম, এই সেই আবুল হাসনাত যিনি মাহমুদ আল জামান নামে আমাদের কাছে তাঁর 'ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায়' হিসেবে পরিচিত ... । আমার এই ঘোষণা শুনে তিনি যেন লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন। তিনি অন্যের প্রশংসা করতে কখনো পিছপা হতেন না কিন্তু নিজের প্রশংসা শুনলে লজ্জায় পালাতে চাইতেন। নিজেকে কীভাবে গুটিয়ে রাখবেন কীভাবে গোপন করে রাখবেন সেই চেষ্টায় তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

আমি খুব দৃঢ়ভাবেই মনে করি সম্পাদক আবুল হাসনাতকে তুলনা করা যায় 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ, "পয়েট্রি পত্রিকার" সম্পাদক মনরো, "কবিতা পত্রিকার" সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর মত লেখক এবং সম্পাদকদের সঙ্গে। সম্পাদক হিসেবে তাঁর ছিল জহুরী চোখ। একজন সফল সম্পাদক যেভাবে নিত্য নতুন লেখক আবিষ্কার করতেন আবুল হাসনাতও ছিলেন ঠিক তাই। আবার শুধু লেখা ছাপিয়ে তিনি ক্ষান্ত হতেন না। তিনি লেখক সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছিলেন একটি শিক্ষিত বিদ্বৎসমাজও।

এ বছর অতিমারীর কারণে ঢাকায় প্রায় ৭ মাস আটকে ছিলাম। তখন কাজ ছিল ঘরে বসে লেখালেখি আর বন্ধুদের সঙ্গে ফোনালাপে সময় কাটানো। জানতাম হাসনাত ভাই ঘরবন্দী। তিনিও অসুস্থ হয়ে বাসায় ছিলেন। সেই অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ নিতে ভুলতেন না। প্রায় সময়ই তিনি কল দিতেন, কথা বলতেন, কুশল বিনিময় করতেন। সবসময় সাবধান করে দিতেন, "করোনার সময় বাইরে বেরবেন না। দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে।"

নিউইয়র্কে চলে আসার দুদিন আগেও হাসনাত ভাইয়ের সঙ্গে ধানমন্ডীর ক্রিমসন কফি শপে দেখা হয়। নাকেমুখে মাস্ক লাগান। দেখা হতেই কুশল বিনিময় তারপর তড়িঘড়ি করে একটা খাম আমার হাতে তুলে দিলেন "এটা রাখুন। "কালি ও কলমে" লেখার জন্যে আপনার খুব সামান্য সম্মানী"। সেই সঙ্গে তাঁর সদ্য প্রকাশিত একটি স্মৃতিচারণমুলক গ্রন্থ "হারান সিঁড়ির চাবির খোঁজে" এবং কালি ও কলম বিশেষ সংখ্যা (আনিসুজ্জামান সংখ্যা)। আমি আগে থেকেই যেন জানতাম যে তিনি ঠিক এমন কাজটিই করবেন। তারপর কফি খেতে খেতে আমাদের কত আলাপ ! সেই আলাপে ছিল আশা, স্বপ্ন আবার আতংক ! করোনায় কি হয় না হয় ! মানুষ চাকরী হারাচ্ছে ! চারদিকে জীবন বিপন্ন, কত হাহাকার ! হাসনাত ভাই তাঁর উদাস চোখদুটো মোটা ফ্রেম বন্দী করে জানিয়েছিলেন সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে তিনি নিউইয়র্ক আসবেন। সেখানে তার মেয়ে আছেন। তার আদরের এক নাতনীও আছেন। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম তাঁর সেই চোখে ছিল কত আশা ! কত প্রাণের ছোঁয়া !

হায় ! এভাবেই বুঝি মানুষ স্মৃতি হয়ে যায় ! এভাবেই বুঝি আলো ঝলমলে রদ্দুরে হাঁটা একটি মানুষ হঠাৎ করে ছায়ার মত অন্ধকারে মিশে যেতে পারে ! কে জানতো তাঁর সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না ! তিনি যেন এই বিদায়ের ঘন্টাটি শুনতে পেরেছিলেন ! তা না হলে "কালি ও কলমের" কাছে পাওনা আমার সব লেখক সম্মানী তিনি পাই পাই করে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে ? তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "হারানো সিঁড়ির চাবির খোঁজে" বইটিরি মত তিনি কি সত্যি তাঁর হারানো চাবিটি খুঁজে পেয়েছিলেন ?

"ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায়" ! হাসনাত ভাই, আপনিও সিটি দিতে দিতে চলে বন্দর ছেড়ে গেলেন ? এই অবেলায় ? আপনাকে খুব মনে পড়ে।

সুদীপ্ত ভৌমিক

''সাদা কালো''

(মঞ্চে আলো জ্বলতে দেখা যায়, উত্তর আমেরিকার কোন একটি শহরের একটি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের ফ্যামিলি রুম। সোফায় বসে টিভি দেখছে উজ্জ্বল। কিন্তু মন সেদিকে খুব একটা নেই। মোবাইল ফোনে কোন সোশ্যাল মিডিয়াতেই বেশি ব্যস্ত। টিভিতে CNN বা কোন নিউজ চ্যানেলে রায়াটের দৃশ্য দেখাচ্ছে। গাড়ি, দোকান জ্বলছে। কিছু মানুষ হাত পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ করছে। লুট তরাজ চলছে। পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। উজ্জ্বলের স্ত্রী শম্পা এক কাপ চা এনে উজ্জ্বলকে দেয়।)

শম্পা নাও ধর। (টিভিতে চোখ রেখে) ইস দেখ দেখ। দোকান থেকে টিভি গুলো নিয়ে কেমন পালাচ্ছে দেখ। এই রে — দোকানটায় আগুন লাগিয়ে দিল ! ছি ছি ছি। আর পুলিশগুলোকে বলিহারি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল দেখছে ?

উজ্জ্বল তাছাড়া কি করবে ? কিছু করার মত মুখ আছে ওদের ? যে ভাবে ওরা কালো মানুষদের উপর অত্যাচার করেছে, তার ফল তো ওদের ভুগতেই হবে। জর্জ ফ্লয়েডকে কি ভাবে মারল দেখনি ? পুলিশ বলে যা খুশী তাই করবে ?

শম্পা তাই বলে এরা দোকান জ্বালাবে, লুট করবে ? এটাকে তুমি প্রতিবাদ বল ? শান্তি পূর্ণ ভাবেও তো প্রতিবাদ করা যায়।

উজ্জ্বল অনেক শান্তি পূর্ণ প্রতিবাদ হয়েছে। লাভ হয়েছে কিছু ? একটা এস্পার ওস্পার না করলে এদের শিক্ষা হবে না। ওদের বুঝতে হবে কালোরা আর মুখ বুজে সহ্য করবে না। রুখে দাঁড়াবেই। নিজেদের অধিকার — বাঁচার অধিকার — জোর করে কেড়ে নেবে।

শম্পা আহা কে ওদের বাঁচতে দিচ্ছে না ? আইন মেনে চললে পুলিশ ওদের ধরবে কেন ? সবচেয়ে বেশি ক্রাইম কিন্তু ওদের মধ্যেই। এটা তুমি অস্বীকার করতে পার না।

উজ্জ্বল ভুল। খুব ভুল কথা। সত্যিটা হল, কোন ক্রাইম হলে, প্রথমেই ওদের সন্দেহ করা হয়, এবং এরেস্ট করা হয়। আর যেহেতু কোর্টে লড়াই করার মত আর্থিক সঙ্গতি ওদের নেই, ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওদের জেল হয়। সুতরাং পরিসংখ্যানটা সহজেই ওদের বিরুদ্ধে ভারী হতে থাকে। আর সামান্য সব কারণে পুলিশ ওদের হ্যারাস করে, এরেস্ট করে। একই পরিস্থিতিতে কোন সাদা মানুষ পড়লে, সে কিন্তু পার পেয়ে যায়। শম্পা এদেশে রেসিজিম যে কতটা গভীরে আস্তানা গেঁড়ে রয়েছে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ওসব সিভিল রাইটস টাইটস সব কেবল খাতায় কলমে।

শম্পা আমাদের রঙও তো ময়লা। কই আমাদের সঙ্গে তো পুলিশ খারাপ ব্যবহার করে না। এই তো সেদিন আমার গাড়ি পুল অভার করালো। সামান্য একটু বেশি স্পীডে চালাচ্ছিলাম। কেমন মিষ্টি করে কথা বলল। আর কি হ্যান্ডসাম চেহারা। টিকিট তো দিলোই না, কেবল বলল, নেক্সট টাইম প্লীজ ড্রাইভ কেয়ারফুলি।

উজ্জ্বল তুমি লাকি, তাই তুমি বেঁচে গেছ। তাছাড়া ওরা জানে ভারতীয়রা ওদের থ্রেট নয়। আর এটাও জানে, আমাদের পকেটে পয়সা আছে, ফলে কোর্ট কাছারি করতে আমরা পিছপা হব না। তবে একটা কথা মনে রেখ। কোন সাদার সঙ্গে যদি তোমার এক্সিডেন্ট হত, তাহলে আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি, ওরা তোমাকেই দোষী সাব্যস্ত করে টিকিট দিত। তখন রঙটাই বিচার করত কে অপরাধী।

শম্পা মোটেই না। রেসিজম বলে চ্যাঁচামেচি করাটা আসলে একট ফ্যাশান হয়ে গেছে। আর এখন হয়েছে আরেক হুজুক - ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার। কেন ব্রাউন লাইভস ম্যাটার করে না? হোয়াইট লাইভস ম্যাটার করে না?

উজ্জ্বল শম্পা, ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার একটা আন্দোলন। কালো মানুষের অধিকারের, কালো মানুষের আত্মসম্মানের আন্দোলন। আমাদের সবার এই আন্দোলনকে সমর্থন করা উচিৎ।

(হঠাৎ বাইরের দরজার বেল বেজে ওঠে। কেউ হাত দিয়ে দরজায় জোরে জোরে আঘাত করে।)

শম্পা উফ, এখন আবার কে এল? মালিনী বলেছিল আসবে, কিন্তু সে তো বিকেলে।

(শম্পা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু দরজার পাশের কাঁচ দিয়ে কিছু দেখে ছিটকে ফিরে আসে। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।)

উজ্জ্বল কি হল? কে এসেছে।

শম্পা একটা লোক। (ঢোক গিলে) কালো।

উজ্জ্বল কালো?

শম্পা হ্যাঁ। বিশাল ভয়ঙ্কর চেহারা। কি করব?

উজ্জ্বল নাম বলল? কি চায় কিছু বলল?

শম্পা আমি কি কিছু শুনেছি নাকি ছাই। দেখেই পালিয়ে এসেছি। উফ এখনও আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে।

(দরজায় আবার জোরে জোরে ধাক্কা দেবার শব্দ শোনা যায়। একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কিছুটা জড়ানো।)

বাইরের কণ্ঠস্বর Help! Open the door! Open the door! Help me. Open the door.

শম্পা দরজা খুলতে বলছে।

উজ্জ্বল সে তো আমিও শুনতে পাচ্ছি।

শম্পা কি করব?

উজ্জ্বল কিচ্ছু করবে না। চুপ করে বসে থাকো।

শম্পা লোকটা সাহায্য চাইছে। (থেমে) তুমি একটু জিজ্ঞাসা করবে কি হয়েছে?

উজ্জ্বল কোন প্রয়োজন নেই। কোনো উত্তর দিও না, ও নিজেই চলে যাবে।

(দরজায় ধাক্কার আওয়াজ আবার শোনা যায়।)

কণ্ঠস্বর Open the door man! Let me in. Open the door.

শম্পা আমার খুব ভয় করছে । কি করব।

উজ্জ্বল আঃ, বললাম তো, চুপ করে বসে থাকো। ফোনটা কোথায়? ফোনটা দাও। 911 কল করবো।

শম্পা পুলিশ ডাকবে ?

উজ্জ্বল কথা না বলে ফোনটা দাও ।

(শম্পা সোফা থেকে ফোনটা তুলে উজ্জ্বলকে দিতে যায় । ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে একাধিক পুলিশের গাড়ির আলো দেখা যায় । পুলিশের গাড়ি থামার শব্দ । দরজা খোলা বন্ধ হওয়ার শব্দ, বেশ কিছু উচ্চকিত কণ্ঠস্বর শোনা যায় । সামান্য ধস্তাধস্তির শব্দ । একটু বাদে শব্দ কমে যায় । আলোর গতি দেখে বোঝা যায় কয়েকটা পুলিশের গাড়ি বেরিয়ে গেল । একট গাড়ির আলো তখনও জ্বলতে থাকে । একটু বাদে সেটাও নিভে যায়, কিন্তু গাড়িটা যায় না । দরজায় বেল বেজে ওঠে । পুলিশ অফিসারের গলা শোনা যায় ।)

অফিসার This is the police. Please open the door.

শম্পা পুলিশ । দরজা খুলতে বলছে ।

উজ্জ্বল শুনেছি ।

(উজ্জ্বল এগিয়ে যায় দরজা খুলতে । দরজা খুলতে দেখা যায় একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে ।)

অফিসার You guys are safe now. We arrested the man thumping your door.

(উজ্জ্বল স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে)

অফিসার You guys okay?

উজ্জ্বল Yes, we are fine. A bit rattled, but fine.

অফিসার Good. Thought I'd check with you guys. Okay, have a nice day.

উজ্জ্বল Thank you officer. May I know what was this all about? Who was that man?

অফিসার Don't know yet. Maybe a drug peddler. We've had some complaints about teen pot smoking in this area. One of our officer's saw him involved in some suspicious activity in your neighborhood park. When the officer tried to get him, he ran. The officer had to call for backup. Anyways, we'll soon find out everything.

উজ্জ্বল Do you think we'd be summoned as witnesses or provide testimony? I mean, we'd be glad to help.

অফিসার I don't think that'd be necessary. Thanks for your offer though. Have a nice day.

উজ্জ্বল You too officer.

(অফিসার ফিরে গিয়ে গাড়িতে বসেন । গাড়ি বেরিয়ে যায় । উজ্জ্বল দরজা বন্ধ করে দেয় ।)

শম্পা এ সেই অফিসার জানো – যে আমাকে টিকিট না দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল । কি হ্যান্ডসাম দেখতে তাই না ?

(উজ্জ্বল শম্পার দিকে তাকিয়ে থাকে । আলো নিভে যায় ।)

সমাপ্ত

বিদিতা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী – অধুনা উত্তর আমেরিকার নিউজার্সি নিবাসী। বাচিক শিল্পী, আবৃত্তিকার ও সঞ্চালিকা। যাপন কবিতা ও কলম। দীর্ঘ ১৪ বছর বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি অনুরাগ সাহিত্য। কলকাতা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পর এই প্রথম বাতায়নের সাথে সংযুক্ত হওয়া।

ইন্দিরা চন্দ – জন্ম ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। মেয়েবেলা কেটেছে মহারাষ্ট্র-র নাগপুরে। তারপর কোলকাতা। মনোবিদ্যা নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করতে করতেই বিয়ে। তারপর কর্মসূত্রে রাজস্থান, গুজরাট, মুম্বাইতে থেকে ২০০১ সাল থেকে দেশের বাইরে। ওমান এবং সংযুক্ত আমিরশাহীতে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে ২০০৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ পাকাপাকি বাস। পেশায় হলেও নেশায় চিরকালই লেখালেখি। কবিতা, গান, নাটিকা, নাটক সব ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন তিনি। পার্থ-এর বঙ্গরঙ্গ থিয়েটার গোষ্ঠী ওনার লেখা মঞ্চস্থ-ও করেছে। বহুদিন ধরে কলম ধরলেও তুলি ধরেছেন এই প্রথম। পুরোপুরি স্বশিক্ষিত শিল্পী। নাচ এবং গানে প্রশিক্ষণ থাকলেও আঁকা শেখেননি কোনোদিন। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু এবং ছন্দের মতন ছবিগুলি রঙের ব্যবহার আর তুলির টান মন কাড়ে তার মননশীলতায়।

জয়তী রায় – বাড়ি কলকাতা। আদতে ভ্রামণিক। ঘুরে বেড়াই এক দেশ থেকে অন্য দেশ। কখনো থাইল্যান্ড, কখনো আমেরিকা, কখনো লন্ডন। মূলত কাজ করি, মানুষের মন নিয়ে। নেশা সাহিত্য। লিখি ছোটগল্প। পৌরাণিক চরিত্র। এবং মনোসত্ত্বিক বিষয় নির্ভর নিবন্ধ। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত বই দ্রৌপদী, মুহূর্তকথা, ব্রহ্মকমল, সুপ্রভাত বন্ধুরা। ২০১৯-এ প্রকাশিত জনপ্রিয় বই ছয় নারী যুগান্তকারী। প্রকাশনা : পত্রভারতী ।

জয়িতা সেন অধুনা মিশিগান নিবাসী, আগে IOWA, নেশা বই পড়া আর ললিত কলা চর্চা। বর্তমানে XPO Logistics Pricing Department-এ কাজ করেন।

জিষ্ণু সেন – যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কনিষ্ঠ পৌত্র এবং সাহিত্য অনুরাগী। University of IOWA থেকে অর্থনীতিতে Doctorate। কবিতা লেখা আর নাটক করা প্রধান নেশা।

মানস ঘোষ — মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক''। এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে।

পল্লববরন পাল — জীবিকাসূত্রে স্থপতি। বিদেশে আন্তর্জাতিক কন্সাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চিফ্ আর্কিটেক্ট হিসেবে ২০১৮ সালে অবসর নিয়ে ফিরেছেন। সঙ্গীত নাটক চিত্রশিল্প সহ সাহিত্যের আকৈশোর হোলসেল্ প্রেমিক। নয় নয় করে এ যাবৎ আঠারোটি গ্রন্থের রচয়িতা- যার মধ্যে একটি গদ্যউপন্যাস, একটি পদ্য উপন্যাস। কিন্তু আদপে এডভেঞ্চার প্রিয় আপামাথা কবি। এক টেবিলে ঠায় বসে থাকার পাব্লিক নন। নিজস্ব কাব্যিক ভাষাশৈলিতে ইদানিং প্রবন্ধ ও লিখছেন 'অনুষ্টুপ' 'আরেক রকম'- র মতো নামী পত্রিকায়।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় — শিকাগোর বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষিকা। আর নেশায় পড়ুয়া। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত। রঞ্জিতার প্রেম হল বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর মাঝে মাঝে কিছু লেখালিখি। রঞ্জিতা 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদিকা। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার বিভিন্ন 'লিটল ম্যাগাজিনে' ওনার লেখা বের হচ্ছে। শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত। সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে – ''Bugging Cancer'' আর ''Three Daughters Three Journeys''। সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার।

সঞ্জয় চক্রবর্তী – অধুনা সিডনী নিবাসী। পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক। বাতায়ন থেকে প্রকাশিত সঞ্জয়ের প্রথম কবিতার বই "মেঘযাপন" পাঠক মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সঞ্জয়ের অন্য পরিচিতি গীতিকার হিসেবে। কলকাতার জনপ্রিয় গায়ক ও সুরকারেরা সঞ্জয়ের লেখা গানে কাজ করছেন।

Sudipta Bhowmik — He lives in USA. He is an engineer by profession but his passion is drama. His plays have been staged in different cities of US and India. His plays have been translated in Hindi, Marathi and English. He is a member of Dramatist Guild of America and founder of his own theater group in New Jersey called ECTA (Ethnomedia Center Of Theater Arts).

সুজয় দত্ত – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

অধমের নাম **সুপ্রতীক মুখার্জী** । পার্থিব বাসিন্দা । ৯টা-৫টার চাকর । পিদিমের মত টিম্‌টিমে বুদ্ধি, তা'ও নেভে না !!

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'সুধাসাগর তীরে', 'সে মহাপৃথিবী', 'আকাশকুসুমের পৃথিবী' । কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

তাপস কুমার রায় – যুক্তরাষ্ট্র সরকারে অর্থনীতির গবেষক তাপস কুমার রায় প্রাথমিকভাবে একজন চিত্রশিল্পী। কনেক্টিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাথরিন মায়ারের কাছ থেকে ফাইন আর্টস প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তাপসের লেখায় ধরা পড়ে প্রবাস-এর একাকীত্ব এবং বাজারি সভ্যতায় তার বিপণ্নতা। তার লেখা পূর্বে দেশ বা দুকুল-এর মত আন্তর্জাতিক বাংলা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে এবং এছাড়াও বাঙালি চলচ্চিত্র গান হয়েছে। 'ঘর খোঁজা সন্ধ্যারা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ।

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।